আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মুখপত্র

১৪০

মাসিক

সুন্নীবার্তা

SUNNI BARTA

৪৯ তম সংখ্যা মার্চ'১১
রবিউস সানি ১৪৩২ হিজরী

প্রচারে

আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)

AHLE SUNNAT WAL JAMA'AT (BANGLADESH)

E-mail :hafej_ma.jalil@yahoo.com. Website : http:// Sunnibarta.wordpress.com

নং- জেপ্রঢা/প্রকা:/২০০৭/০৭

মাসিক ১৪০

সুন্নীবার্তা
SUNNI BARTA

১২.০০ টাকা মাত্র

প্রতিষ্ঠাতা
অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আব্দুল জলিল (রহ:)
এম.এম_এম.এ_বিসিএস

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

সহকারী সম্পাদক
আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল
প্রকাশনা সম্পাদক, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
মোবাইল ঃ ০১৮১৯-৪০৪৭৬৬

নির্বাহী ও সার্কুলেশন সম্পাদক
মোহাম্মদ আব্দুর রব
অর্থ সচিব, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
যুগ্ম-পরিচালক (অবঃ) বাংলাদেশ ব্যাংক
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

টাকা প্রেরণ ও যাবতীয় যোগাযোগ ঠিকানা
মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড় " ১৩২/৩ আহমদবাগ, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬
E-mail:sunnibarta11@yahoo.com

অফিস নির্বাহী
মুহাম্মদ সেকান্দর হোসেন সুমন
সভাপতি, বাংলাদেশ যুবকসেনা
মোবাইল ঃ ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

প্রশ্ন উত্তর ও ফতোয়া বিভাগ
মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

মহিলা অঙ্গন
সৈয়দা হাবিবুন্নেছা দুলন

উপদেষ্টা পরিষদ
অধ্যক্ষ আল্লামা শেখ আব্দুল করীম সিরাজনগরী
পীরে তরীকত হাফেয মাওলানা আবদুল হামিদ আল-কাদেরী
পীরে তরীকত আল্লামা আবুল বশর আল কাদেরী
অধ্যাপক আলহাজ্ব এম.এ. হাই
ড: আজিজুর রহমান চৌধুরী
ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ কুদরত উল্লাহ
আলহাজ্ব মোহাম্মদ মোজাম্মেল হোসেন
পীরে তরীকত মানযুর আহমেদ রেফায়ী
পীরে তরীকত অধ্যক্ষ মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম

সহযোগিতায়
কাজী মাওলানা মোবারক হোসাইন ফরাজী আল-কাদেরী,
আলহাজ্ব মাওলানা সেকান্দার হোসেন আল-কাদেরী,
মাওলানা আবু সুফিয়ান আবেদী আল-কাদেরী,
এ্যাডভোকেট দেলোয়ার হোসাইন পাটোয়ারী আশরাফী,
অধ্যক্ষ ড: এম.এম. আনোয়ার হোসাইন এ্যাডভোকেট,
* মুহাম্মদ জামাল মিয়া * মুহাম্মদ আবদুল মতিন
* মুহাম্মদ আবুল হাশেম * আমিনুল ইসলাম তালুকদার,
* আবুল হোসেন * নূরে আলম * শাকের আহমদ
* মুহাম্মদ হাশেম * আবদুল আজিজ * আবদুল মালেক
* আবু তাহের * মহিউদ্দীন * আবু সাঈদ।

সৌজন্য হাদিয়া ঃ
বাংলাদেশ (প্রতি কপি) ১২ টাকা মাত্র
যুক্তরাজ্য (বার্ষিক) £২.০০
যুক্তরাষ্ট্র (বার্ষিক) $ ২৪.০০
সৌদীআরব (বার্ষিক) S.R. ৪৮.০০
কুয়েত (বার্ষিক) Dinar ১২.০০
ইউরোপীয় ইউনিয়ন (বার্ষিক) Euro ১৫.০০

প্রচারে ঃ আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)
স্বত্বে ঃ সুন্নী ফাউন্ডেশন কমপ্লেক্স

sahihaqeedah.com
Sunni-Encyclopedia.blogspot.com
PDF by (Masum Billah Sunny)

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়	০২
জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন	০৩
গাউসে পাকের কতিপয় শান	১০
নারী অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম	১৫
তাসাউফ (সুফীতত্ত্ব)	১৯
সংগঠন সংবাদ	২৪
প্রশ্নত্তোর	২৫

সুন্নীবার্তার এজেন্ট ও গ্রাহক হওয়ার নিয়মাবলী

* দেশী এজেন্সী : ন্যূনতম ১০ কপি - ৩০% কমিশন। ভিপি যোগে প্রেরণ। এক মাসের টাকা অগ্রীম জামানত।
* বিদেশী এজেন্সী : ন্যূনতম ৫ কপি - ৪০% কমিশন। রেমিটেন্সের মাধ্যমে ০০৫০১২১০০১০৫৩৪১ ব্যাংক একাউন্টে টাকা প্রেরণ করবেন। (তিন মাস অন্তর)
* বিদেশী গ্রাহক : বার্ষিক £ ১২.০০, ৮২৪.০০, SR ৪৮.০০, EURO ১৫.০০, KD ১২.০০।
* দেশী গ্রাহক : (রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে) বার্ষিক ২০০ টাকা মানি অর্ডার যোগে অগ্রিম টাকা প্রেরণ।
* নাম, গ্রাম, ডাকঘর ও জেলার নাম স্পষ্ট অক্ষরে লিখতে হবে।

বিদেশী গ্রাহকগণের রেমিটেন্স প্রেরণের ব্যাংক একাউন্ট

Md. Abdur Rab
SB A/C 00501210010534 1
United Commrcial Bank Ltd.
Mohammadpur Branch, Dhaka-1207

দেশী গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত যোগাযোগ এবং মানি অর্ডারের টাকা পাঠানোর ঠিকানা

মোহাম্মদ আব্দুর রব
"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ
সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

সম্পাদকীয়

আল্লাহর বিধান পরিবর্তন করার ক্ষমতা কারো নেই।

সম্প্রতি ফতোয়া নিষিদ্ধ বিষয়ক হাইকোর্টের রায় এবং নারী উন্নয়নের নামে নারী-পুরুষ সমান অধিকারের বিষয়টি আমাদের দেশে দারুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কুরআন-সুন্নাহ পরিপন্থী কোন আইন প্রণয়ন করবেননা মর্মে জনগনকে আশ্বস্থ করেছিলেন। কিন্তু বর্তমান অবস্থা দৃষ্টে প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি সে অবস্থান থেকে সরে যাচ্ছেন? যা এদেশের মুসলমানরা কখনো আশা করেন নি। আমাদের জানা উচিৎ মহান রাব্বুল আলামীন তার সৃষ্টির প্রতি কখনো অবিচার করেন না। তিনি সম্পত্তি বন্টনের যে নীতিমালা পবিত্র কুরআনে দিয়েছেন- তা পরিবর্তনের বক্তব্য দেয়া মানে আল্লাহর ইনসাফের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করা; যা ঈমান বিধবংসী। আল্লাহর চাইতে বড় জ্ঞানী আর কে আছে? সুতরাং স্পর্শ কাতর বিষয়টি মহান আল্লাহর দেয়া বিধানের উপর ছেড়ে দেয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুক্ষ্ম দৃষ্টি কামনা করছি।

ফতোয়া পবিত্র কুরআনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ; আল্লাহর আইন। কোন অজঁপাড়া গাঁয়ে কোন এক বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামী শরীয়তের মৌলিক একটি বিষয়কে সরাসরি নিষিদ্ধ ঘোষণা কেবল দুঃখজনক নয়; বরং ধর্মদ্রোহীতার শামিল। আমরা প্রাত্যহিক জীবনে অনেক কিছু জানার চেষ্টা করি। বিশেষতঃ ধর্মীয় অনেক বিষয় মাসআলা-মাসায়েল সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞানী-গুণীদের কাছে জানার যে চেষ্টা করে থাকি– তার নামইতো ফতোয়া। যুগ যুগ ধরে ফতোয়া ছিল- আছে এবং থাকবে। ফতোয়া আল্লাহর বিধান। আর আল্লাহর বিধানকে পরিবর্তন করার ক্ষমতা- কারো নেই। ফতোয়ার নামে "ফতোয়াবাজি" বন্ধ হতে পারে। কিন্তু সত্যিকার ফতোয়া বন্ধ করার অধিকার কোন মুসলমানের নেই।

জলীলুল বয়ান ফী তাফসীরিল কুরআন

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

(১৩৯ এর পর)

وَقَالُوْا قُلُوْبُنَا غُلْفٌ. بَلْ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيْلًا مَّا يُؤْمِنُوْنَ-

সরল অর্থ ঃ (৮৮) ইহুদীরা বলে-আমাদের অন্তরে (নূরের) পর্দা পড়ে গেছে। না! বরং তাদের কুফরীর কারণে আল্লাহ্ তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। ফলে তারা অল্প লোকই ঈমান আনে"।

পূর্ব আয়াতের সাথে ধারাবাহিকতা ঃ

পূর্ব আয়াতসমূহে ইহুদীদের ঈমানহারা হওয়ার অনেক কারণ বর্ণনা করা হয়েছে। বর্তমান আয়াতে আরেকটি কারণ বর্ণনা করা হচ্ছে। তাহলো-মুসলমানরা তাদেরকে ঈমান আনার উপদেশ দিলে তারা বলে-আমাদের অন্তরে নূরের পর্দা পড়েছে। অতএব, তোমাদের নবীর মোজেযা দেখা সত্ত্বেও আমাদের পূর্ব ঈমান টলাতে পারবেনা। আল্লাহ্ বলেন-বরং তাদের অন্তরে রয়েছে পরিপূর্ণ কুফরীর পর্দা, যার দারূণ আল্লাহ্র লা'নত তাদের উপর হামেশা বর্ষিত হচ্ছে। তাদের ঈমান গ্রহণের আশা করা বাতুলতা মাত্র। পূর্ব আয়াতে ছিল নবীদের প্রতি তাদের বিদ্বেষমূলক আচরনের কথা। এখন বলা হচ্ছে আখেরী নবীর প্রতি তাদের বিদ্বেষমূলক আচরণের কথা।

বিস্তারিত তাফসীর ঃ

মুসলমানরা মদিনার ইহুদীদেরকে তাদের পূর্ব পুরুষদের কুকর্মের কথা শুনিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আসার জন্য আহবান করতো এবং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মো'জেযাসমূহ শুনাতেন। কিন্তু বদনসীব ইহুদীরা তামাশা করে বলতো-আরে আমাদের অন্তরতো নূরও রহমতে ভরপুর রয়েছে। নতুন ঈমানদার হওয়ার প্রয়োজন কি? আমাদের অন্তর রহমতের গিলাফে আবৃত ও সংরক্ষিত আছে। বাইরের কোন ধূলাবালি এতে প্রবেশ করতে পারেনা। তাই আমাদের অন্তর পাক্ পরিস্কার রয়েছে। তোমাদের ধূলাবালি আমাদের অন্তরে স্থান করে নিতে পারবেনা। এরূপে তারা মুসলমানদের হেদায়াতকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতো। আল্লাহ্ বলেন-তোমাদের স্বভাবেই রয়েছে কুফরী। তাই আল্লাহ্র লা'নত ও অভিসম্পাত তোমাদের প্রতি। তোমাদের অন্তরে নূরের বা রহমতের প্রতিরোধমূলক পর্দার কথা তোমরা বলছো-তা নূরের নয়-বরং যুলমতের পর্দা। ঈমানের পর্দা নয়-কুফরীর পর্দা। মুসলমানদের উপদেশ ও তাবলীগের ফলে তোমাদের মধ্যে খুব কম লোকই ঈমান এনেছে। অথবা তোমাদের মধ্যে পূর্ব হতে খুব কম লোকই ঈমানদার ছিলো।

আয়াতের শিক্ষা ঃ

(১) অত্র আয়াতে বুঝা যাচ্ছে-ইহুদীদের গোঁড়ামী ছিল ক্ষতিকর। ধর্মে দৃঢ়তা প্রশংসনীয়-কিন্তু ধর্মীয় গোঁড়ামী ক্ষতিকর। নিজের ধর্ম পালন করা উত্তম-কিন্তু অন্য ধর্মের প্রতি অসহনশীল মনোভাব খুবই ক্ষতিকর। এটাকে ধর্মীয় গোঁড়ামী বলে। ইহুদীদের মধ্যে রয়েছে ধর্মান্ধ মনোভাব। ইসলামকে তারা কোনমতেই সহ্য করতে পারতোনা এবং এখনও পারেনা। তারা ইসলামের নবীকে অপদস্থ করতে এক পায়ে খাঁড়া। অপরদিকে, মুসলমানরা তাদের নবীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। সুতরাং বর্তমান দুনিয়ায় একমাত্র সহনশীল ও উদার ধর্ম হলো ইসলাম।

(২) বিন্দু বিন্দু পানি যেমন সিন্ধুতে পরিণত হয়-তদ্রুপ-বিন্দু বিন্দু কুফরীও মারাত্মক কুফরীতে রূপ নেয়। যেমন নিয়েছিলো ইহুদীদের মধ্যে।

(৩) নফ্স শয়তান থেকে বাঁচার উপায় হলো-সৎসঙ্গ এখ্তিয়ার করা। কোন পীর বা বুযর্গের সোহ্বতে থাকলে নফ্স শয়তান আয়ত্বে থাকে। নতুবা রহমতকে লা'নত মনে করে, কুফরকে ঈমান মনে করে এবং দোষনীয় বিষয়কে প্রশংসনীয় বিষয় মনে করে।

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতে ইহুদীদের দাবী খন্ডন করে বলা হচ্ছে-তোমাদের অন্তরে ঈমান সংরক্ষণকারী গিলাফ নেই। অথচ অন্যান্য আয়াতে বলা হয়েছে-তাদের কলবে ও অন্তরে সীলমোহর পড়ে গিয়েছে। এই বিপরীত ধর্ম আয়াতের সমাধান কী?

উত্তর ঃ অত্র আয়াতে তাদের অন্তরের পর্দা অস্বীকার করা হয়নি-বরং বলা হয়েছে ঐ পর্দা নূরে ঈমানের পর্দা

নয়-বরং কুফরীর পর্দা। সুতরাং উভয় আয়াতের মর্ম এক। সুতরাং এক আয়াত অন্য আয়াতের বিপরীত নয়।

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ۚ فَلَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

সরল অর্থ ঃ (৮৯) আর যখন তাদের কাছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে নূতন কিতাব এসে পৌঁছলো "কোরআন" যা তাদের কাছে সংরক্ষিত কিতাবের সত্যায়নকারী। আর তারা এর পূর্বে এই নবীর উছিলা নিয়ে কাফেরদের উপর বিজয় প্রার্থনা করতো। অতঃপর যখন তাদের পূর্ব পরিচিত সে নবী তাদের কাছে এসে পৌঁছলেন। তখন তারা তাকে অস্বীকার করে বসলো। অতএব আল্লাহ্‌র লা'নত অস্বীকারকারীদের উপর।"

আয়াতের পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ

পূর্ব আয়াতে ইহুদীদের একটি বদ্ স্বভাবের কথা বলা হয়েছিল যে, তারা মুসলমানদের কোন ভাল উপদেশ মানতোনা। অত্র আয়াতে বলা হচ্ছে-তারা নিজেদের কিতাবও মানেনা। তাদের তৌরাতে আখেরী নবী ও আখেরী কিতাব নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ ছিল। তারা তার অপেক্ষায় ছিলো এবং আখেরী নবীর উছিলা নিয়ে তারা যুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করতো। এখন সে কিতাব ও সে নবী এসে গিয়েছেন। কিন্তু এখন তারা নিজেদের কিতাবের কথাই অস্বীকার করছে। তাই এমন আত্মপ্রতারকদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত ও অভিসম্পাত অনিবার্য।

খোলাসা তাফসীর ও শানে নুযুল ঃ

নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমনের পূর্বে ইহুদীরা নবীজীর এত সম্মান করতো যে, তাদের কোন বাসনা পূরণের জন্য আখেরী নবীর উছিলা দিয়ে দোয়া করতো। এতে তাদের বাসনা পূর্ণ হতো। শুধু তাই নয়-বরং তারা কোন যুদ্ধে গমনকালে আখেরী নবীর উছিলা নিয়ে যুদ্ধ জয়ের জন্য এভাবে দোয়া করতো হে আল্লাহ্! তুমি আমাদেরকে আমাদের বিজয় দান করো এবং আমাদের সাহায্য করো উম্মী (মূল) নবীর উছিলায়।" কিন্তু যখন তাঁর আবির্ভাব হলো এবং কোরআনও অবতীর্ণ হলো-তখন তারা বেঁকে বসলো। এটা ছিল তাদের চরম বদ্‌নসীবী। তাদের ঐ দ্বিমূখী আচরণ সম্পর্কেই অত্র আয়াত নাযিল হয়।

আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদেরকে অভয় দিয়ে এরশাদ করছেন-তোমরা কি করে তাদের ঈমানের আশা করতে পারো? তাদের স্বভাব হলো হঠধর্মী। দেখো! তাদের তৌরাতে কোরআন অবতীর্ণ এবং আখেরী নবীর আগমনের কথা উল্লেখ ছিলো। তাদের কিতাবের ঘোষণা সত্য প্রমাণিত হওয়া কোরআন নাযিলের উপর নির্ভরশীল ছিলো। তাদের উচিৎ ছিলো কোরআন নাযিলের ব্যাপারে খুশী হওয়া ও আনন্দ উল্লাস করা। তাদের বলা উচিৎ ছিল-দেখো! আমাদের তৌরাতের ঘোষণা সত্য; কোরআন আমাদের তৌরাত ও আমাদের নবীগণকে সত্য বলে সাক্ষ্য দিচ্ছে। কিন্তু তারা তা না করে বলেছে-কোরআন মিথ্যা, নবী মিথ্যা। এতে তো প্রকারান্তরে তাদের নিজেদের কিতাব এবং নবীর ঘোষণাকেই মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হচ্ছে। এটাই তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নতের প্রধান কারণ। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য-ইহুদীরা আখেরী নবী ও আখেরী কিতাবের প্রতীক্ষায় ছিলো এতোদিন। তারা যে কোন মনোবাসনা পূরণের জন্য আখেরী নবীর উছিলা ধরতো। মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভের জন্য নবীর উছিলা ধরে দোয়া করতো। এত ভক্তি, এত সম্মান করার পরও যখন সেই প্রতিক্ষীত নবী ও কোরআন এসে গেলো-তখন তারা বিগড়ে গেলো। নবীকে অস্বীকার করলো, কোরআনকে অস্বীকার করলো। এমনকি জিবরাঈলকে তাদের দুশমন বলে ঘোষণা দিলো। এর কারণ ছিলো তাদের সর্দারী মনোভাব। মাথার মধ্যে আঘাত আসলে তখন আর কারো মাথা ঠিক থাকে না।

অত্র আয়াতের শিক্ষা ঃ

(১) নবীওলীগণের উছিলায় দোয়া কবুল হয়। এটা অস্বীকার করা কুফরী। কেননা, ইহুদীদের উছিলা ধরাকে আল্লাহ্ সমর্থন জানিয়েছেন।

(২) যারা উছিলাকে শির্ক বলে-তারা ইহুদীদের চেয়েও জঘন্য অপরাধী। দেখুন, ওহাবীদের কিতাব তাকভিয়াতুল ঈমান এবং সৌদী সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন পুস্তক। তাদের প্রচারক হলো এদেশীয় তথাকথিত ইসলাম ব্যাপারীরা।

প্রশ্ন ও উত্তর ঃ

প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াত দ্বারা বুঝা যাচ্ছে-ইহুদীদের কাছে

সংরক্ষিত তৌরাত কিতাবকে কোরআন সত্য বলে দাবী করছে-অথচ উহা ছিল পরিবর্তিত।

উত্তর ঃ আয়াতে لما معهم শব্দ রয়েছে-যার অর্থ পূর্ব হতে তাদের কাছে যে মূল কিতাব রক্ষিত ছিল। যদি مصدق.কিতাব তাদের সাথে বলা হতো তাহলে পরিবর্তিত কিতাব বুঝাতো। অতএব মূল তৌরাতকেই কোরআন স্বীকার করে-পরিবর্তিতকে নয়। কোরআন বলে দিয়েছে-তারা তৌরাতের যিনা সম্পর্কীত আয়াত ও আহকাম পরিবর্তন করেছে। চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান তারা পরিবর্তন করে ফেলেছে।

প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতে বলা হয়েছে-ইহুদীরা কোরআন এবং ছাহেবে কোরআন-নবী আখেরুজ্জামানকে মানতো। তাহলে তাদেরকে কাফের বলা হলোনা কেন?

উত্তর ঃ তারা প্রথম দিকে মানতো-না দেখে। যখন দেখেছে-তখনই অমান্য করতে শুরু করেছে। জানতো সত্য। কিন্তু মানতো না। তাই কাফের। আবু জাহেলও নবীজীকে জানতো- কিন্তু মানতো না।

প্রশ্ন ঃ কোরআনে নির্দেশ আছে-মানুষের সাথে উত্তম কথা বলার জন্য। কিন্তু আয়াতে বলা হচ্ছে কাফেরদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নত। ইহাই কি উত্তম কথা?

উত্তর ঃ চোরকে চোর বলা, কাফেরকে কাফের বলাই উত্তম কথা। তা না হলে সমাজে ভাল মন্দের তমিজ থাকবে না।

প্রশ্নঃ আর্য সমাজের নেতা সত্যানন্দ বলেছে-তোমরা ইহুদীদেরকে কাফের বলছো এবং লা'নত দিচ্ছো। তারাও তো তোমাদেরকে লা'নত দিচ্ছে। তাহলে কি করে বুঝা যাবে-তোমরা সত্য?

উত্তর ঃ চোর পুলিশকে গালি দেয়-পুলিশও চোরকে গালি দেয়। তোমাদের মধ্যে দোষী কে তা বুঝা যাচেছ না। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষও ভাল মন্দ তমিজ করতে পারে; পারোনা কেবল তোমরা। দুনিয়ার বাজারে ভালমন্দ সব জিনিসই কেনাবেচা হয়। জ্ঞানী লোকেরা ভালমন্দ ঠিকই চিনে এবং ভাল জিনিস খরিদ করে। তোমাদের ধর্ম যে ঠিক কি করে বুঝলে? নিজেরটা বুঝই পরেরটাই বুঝ না।

প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতে বুঝা যায় - ইহুদীরা কোরআন চিনতো। তাই কোরআনের উছিলা দিয়েই তারা দোয়া করতো-নবীর উছিলা দিয়ে নয়। এর প্রমাণ হলো আয়াতের মধ্যে مصدق শব্দটি ব্যবহৃত হয় মানুষ ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে-যাদের জ্ঞানবুদ্ধি নেই। সুতরাং নবীর উছিলা ধরা অত্র আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় না। (দেওবন্দী অলেমগণ)।

উত্তর ঃ আপনারা ভুল বুঝেছেন-কোন কোন সময় বিবেকবান মানুষের ক্ষেত্রেও مصدق শব্দ ব্যবহৃত হয়। দেখুন! আল্লাহ্ পাক সৎ মাকে বিবাহ করা হারাম বলেছেন যে আয়াতে-সে আয়াতেই আছে ولاتنكحوا ما نكح ءاباؤكم من النساء অর্থাৎ তাকে তোমরা বিবাহ করো না। যাকে বিবাহ করেছে তোমাদের পিতা। এখানে مانكح অর্থ সৎমা। তাহলে বুঝা গেল مصدق দ্বারা নবীকেই বুঝানো হয়েছে। অত্র ৮৯ আয়াতে। তারা নবীকে উছিলা দিয়েই দোয়া করতো-কোরআনকে উছিলা করে নয়। কেননা সে সময় তো কোরআন নাযিলই হয়নি। সাহাবায়ে কেরাম অনেক সময় বুঝতে পাতেন না-নবীজী যা বলছেন-তা কোরআন কিনা। নবীজী বলে দিতেন আমার কথার এই অংশ হাদীস এবং এই অংশ কোরআন। সুতরাং-তোমরা কোরআন অংশ লিখে নাও। আমার হাদীসের অংশ নয়। অন্য একটি আয়াত দেখুন-সেখানে ه অর্থ নিশ্চিতরূপে নবী। যথা يعرفونه كما يعرفون ابناءهم অর্থাৎ মক্কার মোশরেক এবং ইহুদীরা নবীকে এভাবে চিনতো যেভাবে আপন সন্তানকে চিনে। এখানে هم ও ه অর্থ নবী এবং সন্তান-উভয়ই। বুঝা গেল-৮৯ আয়াতের অর্থ নবীকে তারা পূর্ব হতে চিনতো।

بِئْسَمَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُ بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ.

সরল অর্থ ঃ (৯০) যে জিনিসের বিনিময়ে তারা নিজেরদেরকে বিক্রি করে দিয়েছে-তা খুবই মন্দ। কেননা, আল্লাহ্ যা নাযিল করছেন-তা অস্বীকার করেছে এই হঠকারিতার দরুন যে, আল্লাহ্ আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা করেন-তাঁর উপর অনুগ্রহ নাযিল করেন। অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধ অর্জন করছে। আর কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।"

পূর্বাপর সম্পর্ক ঃ

ইহুদীদের পূর্ব হতেই তৌরাত বেচাকেনা করতো। তারা

ছিল পরশ্রীকাতর। নবুয়ত অন্য কোন বংশে যাক-এটা তারা বরদাস্ত করতোনা। যাদের অন্তরে অন্যের প্রতি বিদ্বেষী মনোভাব কাজ করে-তারা আল্লাহ্‌র ক্রোধের পর ক্রোধ বহন করে মাত্র। আখেরী নবীর অন্য বংশে আগমনে তারা ছিল ক্ষুব্ধ। অত্র আয়াতে তাদের মনের জ্বালা ও অস্বীকৃতির পরিনাম বর্ণনা করা হয়েছে।

খোলাসা তাফসীর ঃ

ইহুদীরা নবী কমির সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-আগমনের পূর্বে যেকোন বিপদে/আপদে বা যুদ্ধ যাত্রায় হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উছিলা দিয়ে দোয়া করে সফল হতো। কিন্তু নবীজীর আগমনের পর তারাই অবিশ্বাসীতে পরিণত হলো। এজন্য তাদের উপর আল্লাহ্‌র লা'নতের কথা পূর্ব আয়াতে বর্ণনা করার পর অত্র আয়াতে তাদের অস্বীকৃতির আরেকটি গযবের উল্লেখ করে আল্লাহ্‌ বলেন-তারা বলে-আল্লাহ্‌ কেন নবুয়ত অন্য বংশে স্থানান্তর করলেন? আমাদের বংশে কেন প্রেরণ করলেন না? এই জ্ঞানহীন লোকেরা এমন এক ব্যবসা জুড়ে বসেছে-যার ফলাফল হলো লাভোর চেয়ে লোকসান বেশী। তাদের ব্যবসার পুঁজি হলো নিজ স্বার্থ। তাদের বদ্‌ আমল হলো এমন মাল-তারা তাদের মূল্যবান জীবন বিসর্জন দিয়ে উপার্জন করছে। তারা নবীর আগমনে বিদ্বেষ বশতঃ তাঁকে অস্বীকার করে বসলো। তাই তারা একের পর এক কুফরী করে চলেছে। এখন তারা আল্লাহ্‌র উপরও এ ব্যবহারে নারাজ। কাজেই তারা গযবের পর গযব কামনাই করছে।

আয়াতের শিক্ষা ঃ

(১) হাছাদ বা বিদ্বেষ এমন এক মারাত্মক রোগ যা মানুষ কুড়ে কুড়ে খায়। বিদ্বেষ পোষিত ব্যক্তির এতে কোন ক্ষতি হয় না-বরং বিদ্বেষ পোষনকারী ঈমান ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং অন্তরে কালিমা পড়ে যায়। ইহুদীরা বিদ্বেষ পোষণ করেই গযবে পতিত হয়েছে।

(২) নবুয়ত ও বেলায়াত খোদার দান। অত্র আয়াতে নবুয়তকে খোদার দান বলা হয়েছে।

(৩) আল্লাহ্‌র দয়া কোন ব্যক্তি বা বংশের সাথে খাস নয়। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা করেন-আপন দানে ধন্য করেন। ইহুদীদের বংশী পূজা আর মুসলমানদের খান্দানী পূজা তাদেরকে ধবংস করেছে।

(৪) রাফেযী শিয়ারা ইহুদী সদৃশ। ইহুদীরা নবুয়তকে তাদের বংশের মধ্যে সীমিত করেছিল। আর রাফেযী শিয়ারা ইমামত ও খেলাফতকে সীমিত করেছে ১২ ঈমামের মধ্যে। নবীজী বলেছেন-খেলাফত চলবে ৩০ বৎসর পর্যন্ত-আর শিয়ারা তাকে দীর্ঘায়িত করেছে ১২ ইমাম পর্যন্ত। সুতরাং যারা ১২ জন ইমাম এ বিশ্বাসী তারা বাতিল।

(৫) "আযাবে মুহীন" বা অপমানজনক শাস্তি কাফেরদের জন্য খাস। মুসলমানরা যতই গুনাহ করুক তাদের আযাবে মুহীন' দেয়া হবেনা। বরং তাদের শাস্তি হবে গুনাহ ময়লা সাফ করার জন্য। যেমন-পিতা সন্তানকে শাসন করেন সংশোধনের জন্য। তদ্রুপ আল্লাহ্‌ নবীজীর গুনাহগার উম্মতকে শাস্তি দিবেন পাপ মোচনের জন্য। পাপ মোচন হয়ে গেলেই পুনরায় আপন ঘরে তুলে নেবেন।

(৬) আখেরী নবীকে অস্বীকার করার অর্থ সমস্ত নবীকেই অস্বীকার করা। দেখুন-অত্র আয়াতে বলা হয়েছে ان يكفروا بما انزل الله অর্থাৎ নবীকে অস্বীকার করার মাধ্যমে তারা আল্লাহ্‌র অবতীর্ণ সব কিছুকেই অস্বীকার করলো।

প্রশ্ন ও জবাব ঃ

প্রশ্ন ঃ গযবে পতিত হওয়ার অর্থ-আল্লাহ্‌র রাগ-গোস্বায় পতিত হওয়া। গোস্বা করা বা রাগ করাতো হারাম। আল্লাহ্‌ তো দোষত্রুটি হতে পাক। তাহলে এর জবাব কী?

উত্তর ঃ আল্লাহ্‌ সব দোষ ত্রুটি হতে মুক্ত। যেখানে গোস্বা বা অভিসম্পাত শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে-তার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শাস্তির ইচ্ছা করা। ইহা দোষনীয় নয়।

(২) ইহুদীরা তাদের বংশে নবুয়ত আসার ইচ্ছা পোষণ করাতে এমন কি অন্যায় হয়েছে? হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম তো আপন বংশে নবী পাঠানোর জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেছিলেন।

উত্তর ঃ নবুয়ত নিজ বংশে কামনা করা দোষনীয় নয়-দোষ হলো নবীর সাথে হিংসা করা। মালের প্রতি আকর্ষণ দোষনীয় নয় বরং মাল চুরি করা এবং মালদারকে হত্যা করা অপরাধ।

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا
أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ
مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ

قَبْلُ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ. وَلَقَدْ جَآئَكُمْ مُّوْسٰى بِالْبَيِّنٰتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهٖ وَاَنْتُمْ ظٰلِمُوْنَ.

সরল অর্থ ঃ (৯১-৯২) আর স্মরণ করুন-যখন তাদেরকে বলা হলো-তোমরা ঈমান আনো আল্লাহ্‌র নাযিলকৃত সব বিষয়ের উপরে। তখন তারা বললো-আমরা শুধু ঈমান আনি বা বিশ্বাস করি-যা আমাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে। তারা অস্বীকার করে-তাদের একটি ছাড়া অন্য সব কিছু। অথচ এই গ্রন্থ সত্য এবং সত্যায়ন করে ঐ গ্রন্থের-যা তাদের সাথে রয়েছে। হে হাবীব! আপনি বলে দিন-তাহলে ইতিপূর্বে তোমরা আল্লাহ্‌র নবীদেরকে শহীদ করলে কেন-যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো? আর তোমাদের কাছে সুস্পষ্ট মো'জেযা সহ হযরত মূছা এসেছিলেন। এরপর তাঁর অনুপস্থিতিতে তোমরা গো-বঃস বানিয়েছিলে। বাস্তবিকপক্ষে তোমরাই যালেম বা অত্যাচারী।

ধারাবাহিকতা ঃ

পূর্ব আয়াতসমূহে ইয়াহুদীদের যেসব দোষত্রুটি ও কুফরীর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল তারই ধারাবাহিকায় বর্তমান আয়াতে আরেকটি অবাধ্যতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তা হলো-তাদেরকে যখন বলা হলো তোমরা সব নাযিলকৃত সব বিষয়ে ঈমান আনো-তখন তারা হঠকারিতা করে বললো-আমরা কেবল আমাদের উপর নাযিলকৃত বিষয়ের উপরই ঈমান আনবো। অন্যদের কিতাবে বিশ্বাস করবো না। আল্লাহ্‌পাক বলেন-তাহলে তোমাদের কিতাবে কি নবীগণকে হত্যা করার কথা বলা হয়েছিল? বুঝা গেলো-তারা নিজেদের কিতাবই অমান্য করে চলেছে। মুসলমানদের কিতাব ও মুসলমানদের নবীকে তারা কি করে বিশ্বাস করবে? সুতরাং-তাদের ঈমান আনার আশা করা বাতুলতা মাত্র।

খোলাসা তাফসীর ঃ

মদিনার সাহাবী মুসলামনেরা ইহাহুদীদেরকে বলতো তোমরা সমস্ত আসমানী কিতাব মেনে নাও। তারা বলতো-শুধু আমাদের উপর অবতীর্ণ কিতবাই মানবো। আল্লাহ্‌পাক বলেন-তারা নিজেদের মৌরাত ছাড়া অন্য সব কিতাব অমান্য করেছে-অথচ ঐগুলোও সত্য কিতাব এবং প্রকৃত তৌরাতেরই সমর্থক। এটা তাদের হঠাকারিতা মাত্র। পরবর্তী কিতাব অমান্য করার অর্থ-আল্লাহ্‌র এক কথা মানা-অন্য কথা অমান্য করা। সুতরাং-প্রকারান্তরে তৌরাতকেও অমান্য করা। তাদের তৌরাত বিশ্বাসে ঘোষনাটি যে সর্বৈভ মিথ্যা, তা প্রমাণ করার জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরামর্শ দেয়া হচ্ছে- "হে প্রিয় হাবীব! আপনি তাদের বলুন-যদি তোমার তৌরাত মানার দাবীদার হয়ে থাকো, তাহরে বলো ইতিপূর্বে তোমরা নবীগণকে কোন কিতাবের নির্দেশে হত্যা করেছিলো? তোমরা হযরত যাকারিয়া (আঃ), হযরত ইয়াহইয়া (আঃ), হযরত শোয়াইয়া (আঃ)কে হত্যা করেছিলে কোন কিতাবের নির্দেশে? তৌরাত কিতাবে কি এ ধরনের নির্দেশ আছে? বুঝা গেলো-তোমরা মূলতঃ কোন কিতাবই মানছোনা। তোমাদের দাবী মিথ্যা।

আল্লাহ্‌পাক ইয়াহুদীদের আরেকটি জঘন্য অপরাধের কথা উল্লেখ করছেন। হযরত মুছা (আঃ)-এর উপস্থিতিতেই তারা তৌরাতকে অমান্য করেছিল। তারা গো-বৎস তৈরী করে তারা পূজা শুরু করেছিল। তাদের এই স্বভাব তারা পরবর্তীতে নবীগণকে হত্যা করার মত জঘন্য অপরাধ করা তো কোন ব্যাপারই ছিলনা। মুছা (আঃ) নয়টি মোজেযা প্রদর্শন করেছিলেন। আল্লাহ্‌র এত কুদরত চোখে দেখা সত্বেও তারা নবীর বর্তমানেই আল্লাহ্‌কে ছেড়ে গো-বৎস পূজা শুরু করেছিলো। মূলতঃ তারা সীমা লংঘনকারী ও যালেম জাতি।

মদিনার তিনটি ইয়াহুদী গোত্র নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চরম বিরোধী ছিল। তারা নানাহ রকমে বাইরের শত্রুদের সাথে জোট করতো। তাদের প্রতি ইসলামের দাওয়াত দেয়ার ত্রে মুসলমানরা যেসব প্রতিকূলতার সম্মুখীন হতেন তাতে তাদের মনে কষ্ট আসতো। আল্লাহ্‌পাক মুসলমানদের মনোকষ্ট দূর করার জন্য ইয়াহুদীদের পূর্ব কর্মকান্ডের কথা উল্লেখ করে মুসলমানদের এভাবে শান্তবা দিতেন। মুসলমানরা বুঝে ফেলেছিলেন যে, ইয়াহুদীরা আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টির মধ্যে পতিত হয়েছে। অপরদিকে মুসলমানরা আল্লাহ্‌র প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেছে। সাহাবীগণ কোরআনকে অক্ষত রেখেছেন। বিশ্বময় কোরআনের বানী ছড়িয়ে দিচ্ছেন। নবীজীর দ্বীনকে অক্ষত রেখেছেন। সুতরাং- ইয়াহুদীরা- দ্বীনের পরির্তনকারী- আর মুসলমানরা হলো অতি উত্তম জাতি।

আয়াতের শিক্ষনীয় বিষয় ঃ (১) বিজাতীয় লোকদের সাথে ধর্মতর্ক করা কুরআনের সুন্নাত। কোরআন হলো

বিধর্মীদের বাতিল মতবাদ খন্ডন করার উপযুক্ত হাতিয়ার।

(২) বেদ্বীনদের সাথে বাহাছ-মোনাযারা করার ক্ষেত্রে আত্মরক্ষামূলক নীতির পরিবর্তে আক্রমনাত্মক নীতি অবলম্বন করে তাদের নীতির অসারতা প্রমাণ করা নবীগণের সুন্নাত। সুন্নী মোনাযেরগণ বাতিলপন্থীদের বিরুদ্ধে খন্ডনমূলক নীতি অবলম্বন করলে বিরুদ্ধবাদীরা সহজে পরাজিত হবে।

(৩) যে কোন একজন নবীকে অস্বীকার করলে কাফের হয়ে যায়। ইয়াহুদী নাছারাগণ এই মানদন্ডে বর্তমানে নির্ঘাত কাফের। কেননা, তারা আখেরী নবীকে মানে না। নবীগণের মধ্যে কাউকে মানা, কাউকে না মানা কুফরী। অনুরূপভাবে কোন সাহাবীকে মানা, কোন সাহাবীকে না মানাও কুফরী। আল্লাহ্পাক বলেন- "নবীর সমস্ত সাহাবী মোমেন এবং পরস্পর সহনশীল। (সূরা হুজুরাত)

وَاِذْ اَخَذْنَا مِيْثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّوْرَ۔ خُذُوْا مَا اٰتَيْنٰكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوْا قَالُوْا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا۔ وَاُشْرِبُوْا فِىْ قُلُوْبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ قُلْ بِئْسَمَا يَأْمُرُكُمْ بِهٖٓ اِيْمَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ۔

সরল অর্থ ঃ (৯৩) হে ইয়াহুদীগণ, তোমরা স্মরণ করো যখন আমি তোমাদের পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম এবং তাদের মাথার উপর তূর পর্বত তুলে ধরে বলেছিলাম-তোমরা মযবুত করে ধরো- যা আমি তোমাদেরকে দিলাম এবং শুন। তারা বলেছিলো-আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম। আর কুফরীর কারণে তাদের অন্তরে গোবঃস প্রীতি পান করানো হয়েছিল। হে রাসুল! বলুন-তোমাদের ঈমান যা শিক্ষা দিয়েছে তা কতই না মন্দ। যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক-তাহলে ঐ ধরনের কাজ কেন করলে?)

পূর্ব আয়াতের সাথে সম্পর্ক ঃ

পূর্ব আয়াতে ইয়াহুদীরা দাবী করেছিলো-তারা শুধু তৌরাত মানে, অন্য কিছু মানে না। বর্তমান আয়াতে বলা হচ্ছে-না, তোমরা সানন্দে তৌরাত গ্রহণ করোনি। বরং তৌরাত মানতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলো যার কারণে তুর পাহাড় তোমাদের মাথার উপর তুরে ধরে জোর করে মানানো হয়েছিল। সানন্দে তৌরাত গ্রহণ না করার প্রমাণ হলো-আল্লাহ্র ইবাদত ছেড়ে দিয়ে গো বৎস পূজা শুরু করেছিলে, সুতরাং-তৌরাত মানার দাবীটাই মিথ্যা।

খোলাসা তাফসীর ঃ

পূর্ববর্তী আয়াতে ইয়াহুদীদের কয়েকটি বাস্তব কুফরীর প্রমাণ পেশ করার পর বর্তমান আয়াতে তাদের তৌরাত মানার তথাকথিত দাবী খন্ডন করা হচ্ছে, এভাবে-তোমরা তো ঐ জাতি-যারা তৌরাত নাযিলের সাথে সাথে তা গ্রহণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলে। তখন আমি (আল্লাহ্) তোমাদের মাথার উপর তুর পর্বত তুলে ধরেছিলাম এবং জোর জবরদস্তি করে তা মানিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম-তৌরাতকে মযবুত করে ধরো এবং শুন। তা না করলে তুর পর্বত তোমাদের উপর ছেড়ে দেবো। তখন তোমরা মুখে বলেছিলে-আমরা শুনলাম-কিন্তু মনে মনে বলেছিলে-মানবো না। তোমাদের ঐ বাহ্যিক প্রতিশ্রুতি শরিয়ত অনুযায়ী কবুল করে তোমাদের থেকে তুর পাহাড় সরিয়ে নেয়া হয়েছিল। তৌরাত অস্বীকৃতির বাস্তব প্রমাণ হলো-তোমরা মুছা নবীর কিছুদিনের অনুপস্থিতে গোবৎস পূজা আরম্ভ করে দিয়েছিলো। গো-পূজার ঐ নেশা প্রমাণ করে-তোমরা তৌরাতে বিশ্বাসী ছিলেনা। যদি সত্যি সত্যি ঈমানদার হয়ে থাকতে-তাহলে ঐ ধরনের মন্দ কাজ করলে কেন? আল্লাহ্ বলেন-হে প্রিয় হাবীব! আপনি মদিনার ইহুদী গোত্রগুলোকে বলে দিন-তোমাদের পূর্ব পুরুষরা তৌরাতের প্রতি অবিশ্বাসী ছিলে। এতে আশ্চর্য হবার কি আছে? এটা তো তোমাদের জাতীয় স্বভাব। এখনও বিদ্যমান রয়েছে। অত্র আয়াতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং মুসলমানদের শান্তনা দেয়া হচ্ছে যে, তাদের কুফরী জাতিগত এবং স্বভাবগত। সুতরাং মনে দুঃখ নিবেন না।

শিক্ষনীয় বিষয় ঃ

(১) ভয় প্রদর্শন করে মোমেন বানানো যায় না-বরং আল্লাহ্র রহমতের ফয়েয বর্ষিত হলেই ঈমানদার হওয়া যায়। শুধু জানার নাম ঈমান নয়- মানার নাম ঈমান। ইয়াহুদীরা মুছা নবীকে জানতো-কিন্তু তারা নির্দেশ অমান্য করতো। তাই তারা প্রকৃত ঈমানদার নয়।

(২) শরিয়তের বিচার হয় বাহ্যিক প্রমানাদির ভিত্তিতে অন্তরে বিষয় দেখা বা বিবেচনা করা শরিয়তের দায়িত্ব নয়। ইহুদীরা তুর পাহাড় মাথার উপর দেখে মুখে বলেছিলো মেনে নিলাম-কিন্তু অন্তরে ছিলো অবাধ্যতা আল্লাহ্পাক তাদের বাহ্যিক অঙ্গীকার গ্রণ করে

পাহাড় সরিয়ে নিয়েছিলেন। বর্তমানে শরিয়তের বিচার হয় বাহ্যিক প্রমানাদির ভিত্তিতে। অন্তরের বিষয় আল্লাহ্‌র উপর ন্যাস্ত করা হয়। তিন তালাক মুখে উচ্চারণ করলেই শরিয়ত মোতাবেক তালাক হয়ে যায়-অন্তরে তালাক উদ্দেশ্য না হলেও তালাক হবে। কেননা, শরিয়াত বাহ্যিক দিককে দেখে।

(৩) দুনিয়ার শান্তির ভয়ে ঈমান আনলে তা আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণযোগ্য হয়না। আল্লার ভয়ে ঈমান আনতে হবে। ইয়াহুদীরা আযাবের ভয়ে বলেছিলো-আমরা শুনেছি। কিন্তু অন্তরে ছিলো কুফরী।

(৪) মুছা (আঃ)-এর উম্মত এবং শেষ নবীর উম্মতের মধ্যে আকাশ পাতাল ব্যবধান। মুসলমানরা যা করে-আল্লাহ্‌র ভয়ে করে। সুন্নী মুসলমানরা নবীজীর প্রতি অবিচল ভালবাসা পোষন করে।

প্রথম দিকের মুসলমানরা নবীজীর কথায় যুদ্ধের ময়দানে সানন্দে আত্মদান করতো।

কিছু প্রশ্ন ও তার জবাব ঃ

প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে-ইয়াহুদীদেরকে জবরদস্তি করে তৌরাত গ্রহণ করানো হয়েছিল। অথচ আয়াতুল কুরছিতে বলা হয়েছে لَا اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِ অর্থাৎ- "জোর করে ধর্মে দীক্ষিত করা যাবে না।

উত্তর ঃ জোর করে ধর্ম গ্রহণ করানো যাবে না-একথা ঠিক। তবে ধর্মে আসার পর বিধি বিধান মানতে কড়া কড়ি ও জোর জবর করা ফরয। তা না হলে মোরতাদ হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে। ইসলামে দীক্ষিত করার জন্য জবরদস্তি করা নিষেধ-কিন্তু ধর্ম ত্যাগ করলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ফরয। যেমন হয়েছিল চারজন ভন্ড নবীর বিরুদ্ধে হযরত আবুবকর (রাঃ)-এর যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধকে রিদ্দার যুদ্ধ বলা হয়। ইয়াহুদীরা ধর্ম গ্রহণ করেছিলো খুশী মনেই। কিন্তু বিধি বিধান অমান্য করায় তাদের উপর তুর পাহাড় তুলে ধরা হয়েছিল। সুতরাং এই জবরদস্তি জায়েয।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ ইয়াহুদীরা তুর পর্বত মাথার উপর দেখে ভয়ে বলেছিলো-"আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম"। এটা প্রকাশ্যে বলেছিলো বলে বুঝা যায়। سمعنا وعصينا শব্দ দ্বারা। দুই বিপরীত জিনিস একসাথে বলা খুবই জঘন্য অপরাধ। এটা অস্বীকৃতির নামান্তর। তারপর আল্লাহ্‌ কি করে তাদের এই বিপরীত অঙ্গীকার গ্রহণ করলেন?

উত্তর ঃ سمعنا وعصينا শব্দটি মুখে উ"চারণের প্রতীক। ইয়াহুদীরা মুখে উচ্চারণ করেছিলে سمعنا অর্থাৎ আমরা শুনলাম ও মানলাম। কিন্তু عصينا শব্দটি ছিলো অন্তরে গোপন কথা। অন্তরের গোপন কথার ক্ষেত্রেও কোন কোন সময় عصينا ব্যবহার করা যায়। যেমন-ইয়াহুদী মোনাফিকরা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতো راعنا, অর্থাৎ-আপনি নিজ কানে আমাদের কথা শুনুন কিন্তু অন্তরের কানে যেন না শুনেন"।

প্রশ্ন ঃ তুর পর্বত উপরে তুলে ধরার ঘটনার একবার পূর্বে বলা হয়েছে। দ্বিতীয়বার উল্লেখ করার কারণ কি? পুনরাবৃত্তি তো অলঙ্কার শাস্ত্রে নিষিদ্ধ?

উত্তর ঃ ইহা পুনরাবৃত্তি নয়। কেননা পূর্ব আয়াতে سمعنا وعصينا শব্দদ্বয় ছিলনা।

সুতরাং পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন অবান্তর। তদুপরি-পূর্ব আয়াতে প্রকাশ্যে গ্রহণের প্রসঙ্গ উল্লেখ ছিল। বর্তমান আয়াতে অন্য প্রসঙ্গ সম্পর্কে বলা হচ্ছে-তা হলো-অন্তরের মোনাফেকীও অস্বীকৃতি।

প্রশ্ন ঃ অত্র আয়াতে বলা হয়েছে-ইয়াহুদীদের পূর্ব কুফরীর কারণে গো-বৎস পূজা করেছিলো। উক্ত পূর্ব কুফরী কি ছিলো?

উত্তর ঃ ইয়াহুদীদের মিশরে থাকাকালীন এক জাতিকে গো-বৎস পূজা করতে দেখেছিলো। তাদের মনেও সাকার পূজার বাসনা জেগেছিলো। এটা ছিল তাদের প্রস্থস্তিমূলক পূর্ব কুফরী। সে বাসনাটি ছিল কুফরীমূলক।

প্রশ্ন ঃ হযরত মুছা (আঃ)-এর যুগে গো-বৎস পূজা করেছিলো পরে তারা অনুতপ্ত হয়ে নিজেদেরকে হত্যা করেছিয়েছিলো। এতে তাদের তাওবা কবুল হয়। তাহলে তাদের কুফরী রইলো কোথায়?

উত্তর ঃ তাদের তাওবা ছিল হাল্কা ধরনের এবং যবরদস্তিমূলক। হযরত মুছা (আঃ) উক্ত গোমূর্তিটি পোড়া দিয়ে যখন তার ছাই নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন-তখনও কিছু কিচু লোক চুপে চুপে নদীর ঐ স্থানের পানি তারাবরুক মনে করে পান করেছিলো। এতেই বুঝা যায়-তাদের অন্তর থেকে গো-বৎস প্রীতি সমূলে ধবংশ হয়নি। এটাই তাদের কুফরীর আলামত। তদুপরি-যারা ঐ সময় গো-বৎস পূজায় শরিক হয়নি-তারা গো-বৎস পূজারীদেরকে অন্তর দিয়ে ঘৃণাও করেনি। এটাও ছিল তাদের কুফরীর আলামত। সুতরাং গুনাহের প্রতি ঘৃনা পোষন না করারও গুনাহ্‌ বলে গণ্য। *(চলবে)*

গাউসে পাকের কতিপয় শান

(সুন্নীবার্তা ডেস্ক)

হযরত গাউসুল আ'যম জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আপাদমস্তবে কারামাত। তিনি মাতৃগর্ভে থাকা অবস্থা থেকে তাঁর কারামাত প্রকাশ হতে থাকে। ৪৭১ হিজরি (১০৭৭ খিঃ.) থেকে ৫৬১ হিজরী (১১৬৭ খ্রি.) পর্যন্ত দীর্ঘ ৯০ বছরের আদর্শ জীবনে তাঁর যেসব কারামাত প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো লিখতে গেলে বহু বৃহৎ পরিসরের কিতাবে পরিণত হবে। এ নিবন্ধে নির্ভরযোগ্য জীবনীগ্রন্থাবলী থেকে ঐগুলোর কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস।

।। এক ।।

ওলীকুল সম্রাট হুযুর গাউসে আ'যম দস্তগীর শায়খ মুহিউদ্দীন আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু ৪৭১ হিজরি মোতাবেক ১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দে ১লা রমযান সোমবার সুবহি সাদিক্বের সামান্য পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন।

তাঁর জন্মের পূর্বে: তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তখন একদিন এক ভিক্ষুক হুযুর গাউসে পাকের আব্বাজান হযরত সাইয়্যেদ আবু সালিহ মূসা জঙ্গী দোস্ত রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হি'র বাড়িতে এসে ভিক্ষা চাইলেন। ঘটনাচক্রে সেদিন বাড়িতে কোন পুরুষ ছিলেন না। ভিক্ষুক তার অসহনীয় ক্ষুধার কথা বলে কিছু খাবারের জন্য খুব কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। হুযুর গাউসে পাকের পূন্যবর্তী আম্মাজান সাইয়্যেদা উম্মুল খায়র ফাতিমা রাহমাতুল্লাহি তা'আলা আলায়হা দয়াপরবশ হয়ে পর্দার আড়াল থেকে কিছু খাবার এগিয়ে দিলেন। খাবার খেয়ে যখন পাপিষ্ট ভিক্ষুক বুঝতে পারল যে, বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ নেই। তখন নরাধমটি অন্দর মহলে প্রবেশ করতে ঔদ্ধত হলো। হুযুরের আম্মাজান দিশেহারা হয়ে ভিক্ষুকের হাত থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর দরবারে সাহায্যের জন্য ফরিয়াদ করতে লাগলেন। তাঁর দো'আ ক্ববূল হলো। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে সাহায্য করলেন তাঁরই গর্ভস্থ সন্তান গাউসুস্ সাক্বালাঈন হযরত শায়খ আবদুল ক্বাদের জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর মাধ্যমে। আল্লাহ পাকের কুদ্‌রতে এহেন বিপজ্জনক মুহূর্তে হুযুর গাউসে পাকের রুহ মুবারক মাতৃগর্ভ থেকে বের হয়ে একটি বাঘের রূপ ধারণ করে মুহূর্তের মধ্যে ওই ভিক্ষুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং তাকে হত্যা করে পুণরায় মাতৃগর্ভে ফিরে গেলেন। তখন হুযূরের আম্মাজানও বুঝতে পারেন নি যে, বাঘটি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো? তবে পরবর্তীতে হুযূর গাউসে পাক শৈশবকালে তাঁর আম্মাজানকে ঘটনাটি স্মরণ করিয়া দিয়েছিলেন এবং এর বাস্তবতা সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছিলেন। (মানাক্বিবে গাউসিয়া)

তিনি মায়ের গর্ভে থাকাবস্থায় পবিত্র ক্বোরআনে করীমের ১৮ পারা মায়ের মুখে শুনে শুনে হিফয্ করে নিয়েছিলেন। উল্লেখ্য, তাঁর আম্মাজান ১৮ পারার হাফিযাহ্ ছিলেন এবং তিনি সেগুলো বারংবার তিলাওয়াত করতেন। (তারগীবুল মানাযির) হুযূর গাউসে পাক যেদিন জন্মগ্রহণ করলেন সেদিন ছিলো ১লা রমযানুল মুবারক। পূর্বদিন সন্ধ্যায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন ছিলো বিধায় রমযানুল মুবারকের চাঁদ দেখা যায় নি। তাই লোকেরা পরদিন (১লা রমযান) রোযা রাখবে কিনা হযরত আবু সালেহ মূসা জঙ্গী দোস্ত (হুযূরের আব্বাজন)কে জিজ্ঞেস করলো। তাঁর মনে হলো যে, তাঁর মহিয়সী স্ত্রী বলেছিলেন যে, ওইদিন ভোর থেকেই তাঁর নবজাত শিশু মায়ের দুধ পান করেন নি। তখন তিনি বুঝতে পারলেন যে, তাঁদের শিশুটি ১লা রমযানের রোযা পালন করছেন (যা পরবর্তীতে প্রমাণিত হয়েছিল)। তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন- আজ রমযানের প্রথম দিন, গতকাল চাঁদ উদিত হয়েছে; যদিও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে তা দেখা যায় নি।

শৈশবে তিনি যখন মক্তবে পড়তে যেতেন, তখন গায়েবী আওয়াজ আসতো "আল্লাহর ওলীর জন্য জায়গা প্রশস্ত করে দাও।" তখনই ছাত্রদের ভিড়ে তারা তাঁর জন্য বসার জায়গা করে দিতো।

পিতার ইন্তিকালের পর তিনি কিছুদিন সংসারের হাল ধরেন। একদিন তিনি গাভী নিয়ে মাঠে যাচ্ছিলেন। কিন্তু গাভীটি পেছনের দিকে ফিরে মানুষের মতোই বলতে

লাগলো, !হে আবদুল ক্বাদির! আপনাকে না এ কাজের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে, না এ কাজের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?" তখনি তিনি তাঁর আম্মাজানের অনুমতি নিয়ে বাগদাদের দিকে শিক্ষার্জনের জন্য রওনা হয়ে গেলেন।

পথিমধ্যে ডাকাতদলঃ পিতার ইন্তিকালের সময় তিনি ৪০ টি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যান। তাঁর আম্মাজন ওই চল্লিশটি স্বর্ণমুদ্রা গাউসে পাকের দ্বীনী শিক্ষার্জনের জন্য যাত্রাকালে জামার বগলের নিচে সেলাই করে দিলেন, যাতে সেগুলো প্রয়োজনে খরচ করতে পারেন। আর সদা সত্য কথা বলার জন্য উপদেশ দিয়ে বাগদাদ অভিমূখে একটি ব্যবসায়ী ক্বাফেলার সাথে তাঁকে রওনা করে দিলেন। কিন্তু পথিমধ্যে ক্বাফেলা ৬০ জন অশ্বারোহী ডাকাতদল দ্বারা আক্রান্ত হলো। তারা সবার মাল ও টাকা-পয়সা লুট করার পর গাউসে পাককেও জিজ্ঞেস করলো, তাঁর নিকট কিছু আছে কি না তিনিও মায়ের উপদেশ অনুসারে বললেন, "হ্যাঁ, আমার নিকট ৪০ টি স্বর্ণমুদ্রা আছে, সেগুলো আমার আম্মাজান আমার জামার সাথে সেলাই করে দিয়েছেন।" অন্য লোকেরা যখন অর্থ-সম্পদ বাঁচানোর জন্য মিথ্যার আশ্রয় নেয়, তখন এ বালকের মুখে নির্দ্বিধায় সত্য কথা উচ্চারিত হচ্ছে! তারা হতবাক হয়ে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে গাউসে পাক বলেন, "আমি আমার মায়ের নির্দেশ পালন করছি। তিনি আমাকে কোন বিপদে পড়িলেও মিথ্যা বলতে বারণ করেছেন।"

গাউসে পাকের মুখে এ কথা শুনে ডাকাতসর্দার আহমদ বাদাভী কেঁদে ফেললো, আর বলতে লাগলো, "হায়রে! এ বালকটি এতবড় ক্ষতির মোকাবেলায়ও মায়ের ওয়াদা ভঙ্গ করেন নি; আমরা তো আল্লাহর ওয়াদা ভঙ্গ করে ডাকাতি করছি। আল্লাহর কতো বান্দার জান-মাল নিঃশেষ করেছি।" এ কথা বলতে বলতে ডাকাতসর্দারসহ দলের সবাই গাউসে পাকের পায়ে লুটিয়ে পড়লো ও তাওবা করলো। তাঁরা তখন লুণ্ঠিত মালগুলো কাফেলার লোকদের মাঝে ফিরিয়ে দিয়ে ক্ষমা চেয়ে নিলো। পরবর্তীতে তাঁরা একেক জন ওলী হয়ে গিয়েছিলেন বলেও প্রমাণ পাওয়া যায়।

হুজুর গাউসে পাকের প্রথম পঞ্চাশ বছর

আপন জীবদ্দশার প্রথম পঁচিশ বছর বয়সে প্রসিদ্ধ মাদরাসা-ই নিযামিয়াসহ ওই সময়ের যুগবরেণ্য ওস্তাদদের নিকট থেকে শরীয়তের ১৩ টি শাখার ও ত্বরীক্বতের বিভিন্ন মক্বামের যাবতীয় বিদ্যা অর্জন করেন হুযূর গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু। তিনি শিক্ষায় শুধু অপ্রতিদ্বন্দ্বী আলিমই ছিলেন না, বরং আধ্যাত্মিকতায় কুত্বুল আক্বত্বাবের মহামর্যাদায় উন্নীত হন। তিনি বলেছেন, "দারাসতুল ইল্‌মা হাত্তা সিরতু কুত্ববান (আমি পাঠ গ্রহণ ও দান করতে করতে কুতুব হয়ে গেছি।) তিনি আপন আদর্শ জীবদ্দশার পরবর্তী ২৫ বছর বনে জঙ্গলে, বিরান মরুভূমিতে কঠোর রিয়াযতে আত্মনিয়োগ করেন। এক পর্যায়ে তিনি 'গাউসিয়াতে কুবরা' (গাউসে আ'যম পদে)'র উচ্চাসনে আসীন হন। পঞ্চাশ বছর বয়সে তিনি হুযূর-ই আকরাম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর বরকতময় নির্দেশে সংসারী হন। তাঁর চার বিবির গর্ভে সর্বমোট ৪৯ জন ছেলে-মেয়ে (২৭ জন ছেলে ও ২২ জন মেয়ে) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা ও তাঁদের বংশধরগণ বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ ও অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন এবং দ্বীন-ইসলামের অকল্পনীয় খিদমত আঞ্জাম দিয়েছেন ও দিয়ে যাচ্ছেন।

।। দুই ।।

আবূ দাউদ শরীফের সহীহ্ হাদীস শরীফ অনুসারে, হুযূর গাউসে পাক হিজরি ৬ষ্ঠ শতাব্দির মুজাদ্দিদ ছিলেন। আর নির্ভরযোগ্য কিতাবাদির বর্ণনা অনুসারে, তিনি হলেন হযরত হাসান আসকারী থেকে আরম্ভ করে ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা পর্যন্তের জন্য গাউসুল আ'যম। (আহলে বায়ত ও সাহাবা-ই কেরাম, তাবে'ঈন ও তাব'ই তাবে'ঈন এবং ইমাম'মাহদী ব্যতীত) সমস্ত ওলীর গর্দান মুবারকের উপর তাঁর কদম শরীফ রয়েছে। তিনি আপন জীবদ্দশায় দ্বীন-ইসলামের উপর অটল থাকে তজ্জন্য দিয়েছেন তাঁর সুদূর প্রসারী, অব্যর্থ ও ফলপ্রসু শরীয়তের শিক্ষা ও তরীক্বতের দীক্ষা, আর ক্বাদেরিয়া, চিশ্‌তিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও মুজাদ্দেদিয়া ইত্যাদি ত্বরীক্বা। আ'লা হযরত বলেন-

অর্থাৎ চিশতিয়া, নক্বশবন্দিয়া, সোহরাওয়ার্দিয়া ও হযরত খাজা আজীমীর ত্বরীক্বতরূপী শরীয়ত-ত্বরীক্বতের ক্ষেতগুলোর কোন্‌টিতে (হে গাউসে আ'যম!) আপনার গাউসিয়াতের বৃষ্টি (ফায়্‌য) বর্ষিত হয় নি? প্রতিটি ত্বরীক্বতই আপনার প্রবর্তিত কিংবা ফায়্‌য্‌প্রাপ্ত। [হাদাইক্বে বখশিশ] হুযূর গাউসে পাক হলেন 'মুহিউদ্দীন'

(ইসলামের প্রতিটি শাখা-প্রশাখাকে নতুন জীবনদাতা)। তিনি নিজে হাম্বলী মাযহাবের অনুসরণ করতেন এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত লা-মাযহাবীদের কার্যত খন্ডন করে যান। তাঁর সমসাময়িক সমস্ত বাত্বিল ফির্ক্বার দাঁতভাঙ্গা খন্ডন করে দুনিয়াব্যাপী সুন্নী মর্তাদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

।। তিন।।

ওলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন ও এর অনন্য প্রতিদান ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে আলী তামীমী বর্ণনা করেছেন, আমি তখন যুবক। মাদরাসাহ্-ই নিযামিয়ায় দ্বীনী শিক্ষা অর্জন করার জন্য ভর্তি হই। আমার এক সহপাঠি ছিলো ইবনে ছাক্বা। তখন বাগদাদে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তাঁর প্রসিদ্ধ কারামাত ছিলো যে, তিনি ইচ্ছা করলে অদৃশ্য হয়ে যেতেন, আবার যখনই ইচ্ছা হতো দৃশ্যমান হয়ে যেতেন। তিনি যামানার গাউস হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। একদিন আমি (আবদুল্লাহ তামিমী), ইবনে সাক্বা ও যুবক আবদুল ক্বাদির জীলানী ওই বুযুর্গের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবার সিদ্ধান্ত নিয়ে রওনা হয়ে গেলাম। পথিমধ্যে ইবনে ছাক্বা বললো, "আমি ওই বুযুর্গকে এমন এক প্রশ্ন করবো, যার জবাব তিনি দিতেন পারবেন না। "আমি (আবদুল্লাহ তামীমী) বললাম, "আমিও একটি প্রশ্ন করবো। দেখি তিনি কী জবাব দেন।" কিন্তু হুযূর গাউসে পাক বললেন, "আমি তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য নয়; বরং তাঁর দীদার ও ফায়্য-বরকত লাভ করার জন্য যাচ্ছি। সুতরাং, আমি তাঁর দীদার ও কৃপাদৃষ্টির অপেক্ষাই করতে থাকবো।"

ইমাম আবদুল্লাহ তামীমী বললেন, "আমরা ওই গাউসের বরকতময় দরবারে গেলাম। দেখলাম তিনি আপন আসনে নেই। আসন খালি। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে দেখতে পেলাম তিনি আপন আসনে হাযির। তিনি ইবনে ছাক্বার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ইবনে সাক্বা! তোমার বিনাশ হোক! তুমি আমাকে অমুক প্রশ্ন করে লা-জাওয়াব করতে চাও? এই নাও তোমার প্রশ্নের উত্তর। আমি তোমার মধ্যে অগ্নিশিখা জ্বলতে দেখতে পাচ্ছি। "তারপর তিনি আমার দিকে দেখলেন, আর বললেন, "হে আবদুল্লাহ! তুমিও আমাকে প্রশ্ন করতে চাও আর দেখতে চাও আমি কি জাবাব দিচ্ছি। এই নাও তোমার প্রশ্ন ও তার উত্তর। তোমাকে দুনিয়া পেয়ে বসবে। তাতে তুমি প্রায় ডুবে যাবে। এটা তোমার অশালীন আচরণের পরিণাম।" তারপর ওই মহান বুযুর্গ (গাউস) হুযুর গাউসে পাকের দিকে তাকালেন, আর তাকে কাছে ডেকে নিয়ে অতি স্নেহ ও ভক্তিভরে বললেন, "হে আবদুল ক্বাদির! আপনি আদব প্রদর্শন করে আল্লাহ ও তাঁর হাবীবকে সন্তুষ্ট করেছেন। আমি দেখতে পাচ্ছি আপনি বাগদাদের মিম্বরে ওয়ায করছেন আর ঘোষণা দিচ্ছেন-'আমার এ ক্বদম আল্লাহর সমস্ত ওলীর গর্দানের উপর।' আর অমনি সমস্ত ওলী আপনার আনুগত্য স্বীকার করে আপন আপন গর্দান অবনত করে দিচ্ছেন।"

সুতরাং এ মহান ওলীর ভবিষ্যদ্বীণীর বাস্তবতাও প্রকাশ পেয়েছে। গাউসে পাক তো অদূর ভবিষ্যতে আল্লাহ ও তার হাবীবের পক্ষ থেকে আদিষ্ট হয়ে ওই ঘোষণা দিয়েছেন। আর সমস্ত ওলী তাঁর আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছেন।

ইবনে সাক্বা এক খ্রিষ্টান নারীর উপর আশিক্ব হয়ে তাকে বিয়ে করার শর্ত পূরণ করতে গিয়ে ইসলাম ত্যাগ করে খ্রিষ্টান হয়ে জাহান্নামের আগুনের উপযোগী হয়ে গেলো। আর আবদুল্লাহ তামীমীকে অর্থের প্রাচুর্য নিমজ্জিত করলো। দ্বীন-ধর্মের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পাক্কা দুনিয়াদার হয়ে গেলো।

।। চার।।

চোরকে কুত্বে পরিণত করে দিয়েছেন:

পবিত্র বাগদাদ নগরীতে এক পাকা চোর ছিলো। চৌর্যবৃত্তি করতে গিয়ে কোন দিন সে ধরা পড়েনি। একদিন সে হুযূর গাউসে পাকের পবিত্র ঘরে চুরি করার মনস্থ করে ঢুকলো। তখন হুযূর গাউসে পাক (রাতে) ঘরের কোণে আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগীতে মাশগূল ছিলেন। চোরটি ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে তালাশ করেও কিছুই দেখতে পেলো না; এমনকি বের হওয়ার পথটিও। সে অবশেষে নিরাশ হয়ে ঘরের এক কোণায় বসে রইল-এ আশায় যে, ভোরের আলোয় অন্তত বের হওয়ার রাস্তাটুকু খুঁজে নেয়া যাবে। সে বসে বসে নানা দুশ্চিন্তায় ভুগছিলো।

ইত্যবসরে হযরত খাদ্বির আলায়হিস সালাম ঘরে প্রবেশ করে হুযূর গাউসে পাককে বলতে লাগলেন, "আজ নেহাওয়ান্দ (ইরান) শহরের কুত্বব ইন্তিক্বাল করেছেন। আজ রাতের মধ্যেই কাউকে ওই শহরের কুত্বব নিয়োগ

করে পাঠিয়ে দিন।" উল্লেখ্য, গাউস, কুত্ব, আবদাল, আওতাদ, ইত্যাদি নিয়োগদান করা হুযূর গাউসুল আ'যম দস্তগীর শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর পবিত্র হাতেই ন্যাস্ত। এ কারণে হযরত খাদ্বির আলায়হিস সালাম তাঁকে এই পরামর্শটুকু দিয়ে ছিলেন। ক্বিয়ামতের পূর্বে ইমাম মাহদী রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর শুভাগমন পর্যন্ত হুযূর শায়খ আবদুল ক্বাদির জীলানই 'গাউসুল আ'যম-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন এবং এ দায়িত্বসমূহ পালন করে যাবেন। (নুয্হাতুল খাত্বির, কৃত: মোল্লা আলী ক্বারী)।

সুতরাং, গাউসে পাক তাঁর খাদিমকে ডেকে বললেন, "আমার ঘরের কোণায় একজন লোক চুপ করে বসে আছে। তাকে আমার নিকট নিয়ে এসো।" খাদিম তা-ই করলেন। চোরটি ভয়ে থর থর করে কাঁপছিলো। আর আরয করতে লাগলো, "হুযূর! আমি আর কোন দিন চুরি করবো না। আমাকে ক্ষমা করে দিন! আমি এতো দক্ষ চোর যে, কোন দিন ধরা পড়িনি কিন্তু আজ আপনার নিকট থেকে বাঁচতে পারি নি, ধরা পড়ে গেছি"।

হুযূর গাউসে পাকের দয়ার সাগরে ঢেউ খেললো। তিনি এরশাদ করলেন, "তুমি বড়লোক হবার আশা নিয়ে আমার ঘরে প্রবেশ করেছিলে। কারণ তোমার ধারণা ছিলো, আমার ঘরে বহু মূল্যবান সম্পদ আছে। সুতরাং তোমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দেওয়া আমার জন্য শোভা পায় না। আজ তোমাকে এমন দৌলত দান করবো, যা তোমাকে দুনিয়া-আখিরাতের বাদশাহ বানিয়ে দেবে। অতঃপর গাউসে পাক তাকে তাওবা করিয়ে তার দিকে এমন 'ফায়্যে জামালী'র দৃষ্টি দিলেন যে, মুহূর্তের মধ্যে সে কুত্ববের পদে উন্নীত হয়ে গেলো এটা বেলায়েতের উর্ধ্বতন দশম স্তর। এর উপরে কুত্বুল আক্বতাব, তার উপরে 'গাউস', তার উপরে 'গাউসুল আ'যম। সুবহানাল্লাহ। একজন চোরের এক মুহূর্তেই এতো উঁচু মর্যাদায় উন্নীত হতে ইবাদত-বন্দেগী, সবক, রিয়াযত, মুরাক্বাবা, মুশাহাদা ইত্যাদির কোনটাই প্রয়োজন হয় নি। তখন একজন কুত্ববের প্রয়োজন ছিলো। সুতরাং হুযূর গাউসে পাক একজন সাধারণ মুসলিম (বরং একজন চোর) কেই মুহূর্তের মধ্যে কুত্ববের মর্যাদায় উন্নীত করে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিলেন। নিম্নলিখিত চরণে এদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে-

এক মুহূর্তে ওলীর সান্নিধ্য লাভ করা শত বছরের অকৃত্রিম ইবাদতের চেয়েও অধিক উত্তম।

।।পাঁচ।।

গাউসে পাকের বাবুর্চির ওসীলায় গায়বী খাবার প্রাপ্তি

হযরত গাউসুল আ'যম রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র এক বাবুর্চি দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ ওই মহান দরবারে খাবার পাকাচ্ছিলেন। তাঁর চোখের সামনেই এ মহান দরবারে এসে কতজন লোকের ভাগ্য পরিবর্তিত হলো। চোর পর্যন্ত 'কুত্ব' হয়ে গেলো। নিঃসন্তান সন্তান লাভ করলো। যে যেই মাক্সূদ নিয়ে এসেছে তা পূরণ হয়েছে। কিন্তু বাবুর্চি মনে করলেন যে, তার কোন পরিবর্তন হয়নি। সুতরাং বাবুর্চি একদিন মনের ক্ষোভে কাউকেও কিছু না বলে গাউসে পাকের খানক্বাহ শরীফ ত্যাগ করে জঙ্গলের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। পথিমধ্যে ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের নিচে বসে পড়লেন। ইত্যবসরে, তাঁর ঘুম এসে গেলো। তিনি ঘুমের ঘোরে শুনতে পেলেন-৭০ জন কুত্ব বলাবলি করছেন, আজ তিনদিন যাবৎ আমাদের ভাগ্যে কোন খানাপিনা জুটেনি। ইনি গাউসে পাকের বাবুর্চি। দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ বাবুর্চি হিসেবে গাউসে পাকের দরবারে খেদমত আঞ্জাম দিয়ে আসছেন। আসুন, তাঁর ওসীলা নিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানাই। আশা করি, আল্লাহ আমাদেরকে পানাহার দান করবেন। সুতরাং তাঁরা তাই করলেন।

বাবুর্চির চোখ খুলতেই দেখতে পান-একজন লোক নানা ধরনের খাবারের খাঞ্চা এনে ওই কুত্ববগণের খিদমতে পেশ করলো। বাবুর্চি বুঝতে পারলেন, গাউসে পাকের খিদমত তাঁকে বেলায়তের কোন পর্যায়ে নিয়ে পৌঁছিয়েছে। তিনি দরবারে ফিরে আসতেই গাউসে পাক বললেন, "তোমাকে বিদায় দিতে মন চায়নি বলে দীর্ঘদিন যাবৎ আমার খানক্বাহ শরীফে রেখে দিয়েছি। বাবুর্চি নিজেকে পুনরায় ওই খিদমতে নিয়োজিত রাখার জন্য আবেদন জানালেন। তা মঞ্জুরও হয়েছিলো।

।। ছয়।।

বাঘের উপর গাউসে পাকের দরবারে কুকুরের হামলা

হযরত শায়খ আবূ মাস'ঊদ বর্ণনা করেছেন, আহমাদ জামী নামে এক ভন্ড তপস্বী ছিলো। সে সাধনা ও যাদুর জোরে এক বাঘকে বশীভূত করে নিয়েছিলো। আর

সেটার পিঠে আরোহন করে ইচ্ছামত বিচরণ করতো। লোকেরা তাকে বুযুর্গ বলে মনে করতো।

ঐ তপস্বীর নিয়ম ছিলো-সে যেখানে ও যার কাছে যেতো তার নিকট বাঘের খোরাক স্বরূপ একটি গরু চেয়ে নিতো। একদিন সে গাউস পাকের দরবারের অদূরে একটি গাছের নিচে বসে তার খাদিমের মাধ্যমে হুযূর গাউসে পাকের দরবারে খবর পাঠালো, যেন বাঘের খোরাক হিসেবে একটি গরু পাঠিয়ে দেন।

গাউসে পাক বললেন, "তুমি যাও! আমি একটু পরে গরু পাঠিয়ে দিচ্ছি।" তপস্বীকে তার খাদিম গিয়ে খবর দিলো। তপস্বীও খুশীতে আটখানা। তার ধারণা ছিলো যে, গাউসে পাকের দরবার থেকে তার জন্য হাদিয়া আসলে তার খ্যাতি আরো বেড়ে যাবে। তার ভন্ডামী বুযুর্গী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়ে যাবে। সুতরাং সে ওই হাদিয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলো। এ দিকে হুযূর গাউসে পাক একটি মোটা তাজা গরুসহ তার খাদিমকে পাঠালেন। হুযূরের পাশে ছিলো দরবারের উচ্ছিষ্ট খেয়ে পোষা কুকুরটি। কুকুরটিও লেজ উচিয়ে খাদিমের পেছনে পেছনে যেতে লাগলো। মোটাতাজা গুরু দেখে বাঘের মুখে পানি আসতে লাগলো। হুঙ্কার ছেড়ে যখনি বাঘ গরুটি সাবাড় করতে উদ্যত হলো, তখনই ওই কুকুরটি বাঘের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং বাঘের কণ্ঠনালী ছিঁড়ে ফেললো। বাঘটি গরুর উপর হামলা করার পূর্বেই গাউসে পাকের কুকুরের আঘাতে মারা পড়লো। কুকুরটি বাঘটির দেহ ছিন্ন ভিন্ন করে সেটাকে সাবাড় করেছিলো বলেও বর্ণনাদিতে রয়েছে। এই দিকে এ ভন্ড তাপস ভয়ে কাঁপতে লাগলো আর গাউসে পাকের দরবারে এসে তাওবা করে তাঁর একজন খাঁটি মুরীদ হয়ে গেলো এবং শেষ পর্যন্ত একজন ওলীর মর্যাদাও লাভ করেছিলো।

অর্থাৎ: যার মাথার উপর ওহে গাউসে আ'যম দস্তগীর! আপনার রক্ষণাবেক্ষণের হাত রয়েছে সে কিভাবে দমিত হতে পারে? আপনার দরবারের কুকুরও বাঘকে পর্যন্ত ভয় করে না।

।।সাত।।

হায়াতুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হি ওয়াসাল্লাম'র নূরানী হাত চুম্বনঃ

হিজরি ৫০৯ সাল। হুযূর গাউসে পাকের বয়স শরীফ তখন ৩৮ বছর। তিনি হজ্জ পালন করতে গেলেন। ওই সফরে মদীনা মুনাওয়ারায় গিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর রওযা শরীফের পাশে দাঁড়ালেন, আর নিম্নলিখিত দু'টি পংক্তি আরয করলেন-

অর্থাৎ: ১. দূরে অবস্থানরত অবস্থায় আমি আমার রূহকে প্রেরণ করতাম। আর সেটা আমার পক্ষ থেকে আমার প্রতিনিধি হয়ে এ পবিত্র যমীন চুম্বন করতো।

২. এখন শরীরের পালা। আমি সশরীরে এসে হাযির হয়েছি। হে আল্লাহর রসূল! আপনি সদয় হয়ে আপন ডান হাত মুবারক বাড়িয়ে দিন, যাতে আমার ওষ্ঠ ওই হাত মুবারক চুম্বন করে ধন্য হয়।

এ পংক্তি দু'টি আবৃত্তি করার সাথে সাথে নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আপন নূরানী হাত মুবারক বের করে দিলেন। তখন গাউসে পাক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু হুযূর করীমের হাত মুবারকে চুম্বন করে ধন্য হন। (তাফরীহুল খাত্বির)

উল্লেখ্য, এমনই সৌভাগ্য ৫৫৫ হিজরিতে হযরত শায়খ আহমদ কবীর রিফা'ঈ রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুও লাভ করেছিলেন।

নারায়ে তাকবীর বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম নারায়ে রিসালাত
আল্লাহু আকবার ইয়া রাসূলাল্লাহ (দঃ)

খানকা-এ-জলিলিয়া

"মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ,
রোড নং-২, সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪
ফোন ঃ ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৬

খানকা-এ-জলিলিয়ায় প্রতি ইংরেজী মাসের ২য় বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব হালকায়ে যিকির ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সকল পীরভাই, হুজুরের ভক্তবৃন্দ ও অনুসারী খানকায় উপস্থিত হয়ে এবাদত-বন্দেগী ও হুজুরের রূহানী ফয়েজ লাভ করে আখেরাতের অশেষ নেকী হাসিল করুন।

সালামান্তে- মোহাম্মদ আবদুর রব
ও হুজুরের ভক্তবৃন্দ

নারী অধিকার সংরক্ষণে ইসলাম

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা ঃ শাঈখ মুহাম্মদ উছমান গণী

আল্লাহ (তা'আলা) ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত দিলে সে বিষয়ে কোন মুমিন পুরুষ কিংবা কোন মুমিন নারীর ভিন্ন মত পোষণের এখতিয়ার নেই।" (সূরা-আহযাব, আয়াত-৩৬)।

আমরা মনে করি সাম্প্রতিককালে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে। ইসলাম নারীকে কী অধিকার দিয়েছে তা ব্যাপকভাবে জনগণকে অবহিত করতে হবে। ইসলামের আলোকে নারীর অধিকার আদায়ে সকলকে সচেতন করতে হবে।

ইসলাম নারীকে কী অধিকার দিয়েছে?

ইসলাম নারী ও পুরুষের ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করেছে, দিয়েছে নারীদের জান-মালের নিরাপত্তা ও সর্বোচ্চ সম্মান। জাহিলী যুগে যেখানে মেয়ে শিশুকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, নারীদের হাটে-বাজারে পশুর মতো বিক্রি করা হতো, দাসী হিসেবে ব্যবহার করা হতো, কন্যা সন্তানের জন্মের সংবাদে পিতা-মাতা বিমর্ষ হতো- সেখানে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজীদে এর সমালোচনা করে বলেছেন-

"যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যায়, (যা আদৌ উচিৎ নয়)"। (সূরা-নাহল, আয়াত - ৫৮)। নারীসমাজের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "মেয়ে শিশুরা বারকাত (প্রাচূর্য) ও কল্যাণের প্রতীক"। তিনি আরো বলেন, "যে তিনটি, দুটি বা একটিও কন্যা সন্তান যথাযথভাবে লালন-পালন করবে- সে জান্নাতী"।

তখন মানুষ কন্যাসন্তান অপেক্ষা পুত্রসন্তানকে অগ্রাধিকার দিতো। কিন্তু মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম বললেন- " তোমাদের কারো যদি কন্যাসন্তান ও পুত্রসন্তান থাকে- আর সে যদি তাদের জন্য কিছু নিয়ে আসে- তবে প্রথমে তা মেয়ের হাতে দিবে এবং মেয়ে বেছে নিয়ে তারপর তার ভাইকে দিবে"।

স্ত্রীদের গুরুত্ব সম্বন্ধে মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ 'উত্তম স্ত্রী সৌভাগ্যের পরিচায়ক'। (মুসলিম শরীফ)। স্ত্রীদের গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আরো বলেন ঃ 'তোমাদের মধ্যে সেই উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম'। (তিরমিযী শরীফ)।

বিধবাদের অধিকার সম্বন্ধে ইসলামের নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, "যারা বিধবাদের দায়িত্ব নেয়- তারা যেন আল্লাহর পথে জিহাদকারী- তারা যেন নিরলস নামাজী ও সদা রোজা পালনকারী"। (বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ)

কুরআন কারীম এ "নারী" (নিসা) নামে নারীর অধিকার ও কর্তব্য সংক্রান্ত একটি স্বতন্ত্র বৃহৎ সূরাও নাযিল হয়েছে- যা পুরুষের বেলায় এভাবে হয়নি। এ জন্য জর্জ বার্নার্ড শ' বলেছেন- 'একমাত্র হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই নারীদের যথাযথ মর্যাদা দিয়েছেন।'

নারীর সম্পদের উৎস সমূহ ঃ

ইসলামপূর্ব যুগে নারীগণ সম্পদের মালিক হওয়াতো দূরের কথা- নিজেরাই ছিলো পণ্য। ইসলাম সম্পদে নারীদের ন্যায্য অধিকার দিয়েছে। সম্পদের মালিকানা বিষয়ে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের নির্ধারিত বিনিময় (মহর) দিয়ে দাও"। আরো বলা হয়েছে ঃ "পুরুষগণ তার অর্জিত সম্পদের মালিক হবে- যা তারা অর্জন করবে আর নারীগণ তার নিজ অর্জিত সম্পদের মালিক হবে- যা তারা অর্জন করবে'। (সূরা- নিসা)।

নারীদের সম্পদ ঃ

১। মহর। (স্বামীর কাছ থেকে বিবাহের সময় এককালিন প্রাপ্ত অর্থ)।

২। পিতা-মাতা, নিকটাত্মীয়, স্বামী ও সন্তানের উত্তরাধিকার।

৩। নিজ অর্জিত সম্পদ।

* উল্লেখিত আয়ের উৎসসমূহ থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যয়ের কোন খাত নেই, এমনকি- তার নিজ ভরণ-

পোষণও তার নিজের দায়িত্বে নেই।

এখানে এ কথাও বুঝতে হবে যে, অর্থ-সম্পদ মর্যাদার মাপকাঠি নয়। যেমনঃ একজন শিক্ষক তিনি যত কম বেতনই পান না কেন- তার সম্মান সবচেয়ে বেশী। তাই নারীকে ইসলাম একদিকে তার সামর্থ অনুযায়ী দায়িত্ব ও অধিকার দিয়েছে- অন্য দিকে দিয়েছে মায়ের সম্মান।

ইসলামে পুরুষের প্রাধান্য কেন?

এ প্রসঙ্গে কুরআন কারীমে মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ "পুরুষগণ নারীদের উপর দায়িত্বশীল। এজন্য যে- (সৃষ্টিগতভাবে) আল্লাহ একের উপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন, আর এজন্য যে- তারা (পুরুষেরা) ব্যয় করে (নারীদের মহর প্রদান ও ভরণ-পোষণের জন্য)।" উক্ত আয়াতে কারীমায় নারীর উপর পুরুষের প্রাধান্য বা শ্রেষ্ঠত্বের দু'টি কারণ উল্লেখ করা হয়েছেঃ প্রথম কারণটি প্রাকৃতিক বা সৃষ্টিগত, আর দ্বিতীয় কারণটি সামাজিক বা অর্জিত।

আমরা সামান্য মনোনিবেশ করলে দেখতে পাবো 'আসলে নারী-পুরুষ কখনো সমান নয়। সৃষ্টিগত ভাবেই তাদের মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যেমনঃ নারী-পুরুষের গতি-প্রকৃতি, খাদ্যাভ্যাস-রুচী, শখ,পছন্দ- ইত্যাদি এক নয়। তদুপরি- ওজন ও উচ্চতা, নাড়ী, রক্তচাপ, হরমোন ও জিন -এ রয়েছে প্রচুর পার্থক্য। মানুষ ছাড়াও প্রাণী জগতে নারী-পুরুষের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। যেমনঃ সিংহের কেশর আছে, সিংহীর নেই; বাঘের গোঁফ আছে, বাঘিনীর নেই; মোরগের মাথায় ঝুঁটি আছে, মুরগীর নেই; হাঁসার লেজে বক্র পালক আছে, হাঁসীর নেই; ষাড়ের স্কন্ধে মেধ আছে, গাভীর নেই। ইত্যাদি ইত্যাদি।

নারী ও পুরুষের কর্মক্ষেত্র এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য :

যেহেতু নারী ও পুরুষ সৃষ্টিগতভাবে সমান নয়- তাই তাদের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং কর্মক্ষেত্রও এক নয়। যেমন পুরুষ প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করবে এবং উপার্জন করবে- আর নারী সংসারে বা পরিবারে দায়িত্ব পালন করবে, সন্তান ধারণ ও লালন পালন করবে। পুরুষের পক্ষে যেমন সন্তান ধারণ সম্ভবপর নয়- তেমনী নারীর পক্ষেও প্রতিরক্ষাসহ কঠিন কাজগুলো করা সহজসাধ্য নয়। সুতরাং নারী পুরুষের সমান অধিকার নয়- বরং বলতে হবে ন্যায্য অধিকার বা সুষম অধিকার। দায়িত্ব অনুপাতে অধিকার লাভ হয়। অধিকার সমান করতে হলে দায়িত্বও সমবণ্টন করতে হবে- আর তা হবে বাস্তবে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ও অবৈজ্ঞানিক।

ইসলাম প্রকৃতির ধর্ম। তাই ইসলামের বিধানসমূহ প্রকৃতির অনুকূল। আর ইসলামের বিরোধিতা মানে প্রকৃতির সাথে বিরূপ আচরণ করা। প্রকৃতির বিরুদ্ধাচরণ করলে সভ্যতা ধ্বংস হয়। সংগত কারণে মুসলিম সমাজে এবং মানব সভ্যতায় মেয়ে অপেক্ষা ছেলের দায়-দায়িত্ব বেশী। যেহেতু নারী-পুরুষ উভয়ের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বের পরিধি সমান নয়। তাই উভয়ের মধ্যে সম্পদও সমবণ্টন করা ন্যায়সঙ্গত নয়।

যে সব কারণে ইসলাম উত্তরাধিকারে ছেলেকে বেশী দেয়ার কথা বলেছে- সে কারণগুলো হলো ঃ

(১) বংশ রক্ষা করা, (২) আত্মীয়-স্বজনের তত্ত্বাবধান করা, (৩) পারিবারিক ও সামাজিক দায়িত্ব পালন করা, (৪) স্ত্রীর মহর প্রদান ও ভরণ-পোষণের দায়িত্ব পালন করা, (৫) সন্তানের ভরণ-পোষণ ও লালন-পালনের ব্যয়ভার বহন করা (৬) বৃদ্ধ পিতা-মাতার দেখা-শুনা ও সেবা শশ্রূষা করা।

উল্লেখ্য যে, একজন পুরুষের তিনটি ফরজ খরচের খাত রয়েছে, যা নারীদের নেই। যথা ঃ (১) সাবালক হওয়ার পর থেকে নিজেকে নিজের ভরণ-পোষণ, (২) বিয়ের পরে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ও (৩) সন্তান হলে তাদের ভরণ-পোষণ।

তাই ১৯৪৭-এর পর থেকে ভারত ও পাকিস্তানে এবং ১৯৭১-এর পর থেকে বর্তমান পর্যন্ত বাংলাদেশে মুসলিম উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এই আইন বলবৎ রয়েছে। ভারত সরকার মুসলমানদের উত্তরাধিকার আইনে হস্তক্ষেপ করেনি। এমনকি- সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ইসলামী আইন পাঠ্যভূক্ত। তাই বাংলাদেশেও শুধু ইসলামের বিরুদ্ধে নয় বরং কোন ধর্মের বিরুদ্ধেই কোন আইন বা নীতিমালা করা সঙ্গত নয়।

এক্ষেত্রে এ বিষয়টিও প্রণিধানযোগ্য যে, আদিকাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত মানব সভ্যতায় পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এমনকি- তথাকথিত উন্নতবিশ্ব ইউরোপ আমেরিকাতেও এবং ইহুদী, খৃষ্টান, হিন্দু ও বৌদ্ধসহ

বিভিন্ন ধর্ম গোষ্টিতেও পুরুষরাই নেতৃত্ব দিচ্ছেন- কারণ এটাই স্বাভাবিক। আজো আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও রাশিয়ার মতো দেশে প্রায় ৮০% নারী গৃহিনী। সম্প্রতি শান্তির অন্বেষণে অতি আধুনিকরাও ইসলামিক পরিবার প্রথার দিকে ঝুঁকছেন।

কেন 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি ২০০৮' গ্রহণযোগ্য নয়?

১। কোন দেশের আইন বা নীতিমালা তৈরী হয় সে দেশের সভ্যতা, সংস্কৃতি, সামাজিক ও প্রাকৃতিক পরিবেশ, আবহাওয়া-জলবায়ু, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনার উপর ভিত্তি করে। তাই ইউরোপ-আমেরিকার জন্য যে নীতিমালা প্রযোজ্য বা উন্নয়নে সহায়ক মনে করা হবে- তা আমাদের দেশের জন্যও উপযুক্ত মনে করার কোন কারণ নেই।

২। আমাদের দেশীয় সংস্কৃতি, সামাজিক মূল্যবোধ ও ধর্মীয় চেতনা এবং প্রচলিত আইন নারী উন্নয়নে তথা জাতীয় উন্নয়নে যথেষ্ট সহায়ক। প্রয়োজনে এর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ আরো নীতিমালা তৈরী করা যেতে পারে।

৩। উন্নয়নের উদ্দেশ্য কি? আমরা জানি উন্নয়নের উদ্দেশ্য হলো সমৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে সুখ-শান্তি লাভ করা।

২০০৭ এর আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের জরিপ রিপোর্টে দেখা গেছে- পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দশটি সুখী দেশ হলো দরিদ্র এশিয়ার মুসলিম ১০টি দেশ, যার মধ্যে উন্নয়নশীল বাংলাদেশও রয়েছে। আর পৃথিবীর নিকৃষ্ট দশটি অসুখী দেশ হলো তথাকথিত উন্নতবিশ্ব ইউরোপ-আমেরিকার সেরা ধনী ১০ টি দেশ।

সমান অধিকারের দেশ আমেরিকার মেডিক্যাল এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট ড. আইওনি ব্রিস্টোর ভাষ্যমতে "আমেরিকায় প্রতি বছর প্রায় আট লাখ নারী ধর্ষিতা হন; ৭০% স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করে; ৬৫% স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিয়ে সন্তানসহ তাড়িয়ে দেয়।

এ সকল দৃষ্টান্ত থেকে আমরা বুঝতে পারি- উন্নয়ন-সমৃদ্ধি আর সুখ-শান্তি এক নয়। আর যে উন্নয়নে সুখ-শান্তির পরিবর্তে অশান্তি বৃদ্ধি হয়- সে উন্নয়ন কোন বুদ্ধিমান লোকের কাম্য হতে পারে না।

৪। নারী উন্নয়ন মানে কি? তথাকথিত উন্নত বিশ্বে যেখানে সন্তান তার মাতৃ-পিতৃ পরিচয় বঞ্চিত; যুব সমাজ অন্য একটি মেয়ে/নারীকে দায়িত্ব নেয়ার ভয়ে বিয়ে করে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে চায় না, বরং শয্যাসঙ্গীনী করে। অহরহ, বৃদ্ধ পিতা-মাতা সন্তানের কাছ থেকে পান অবহেলা- তাদের ভাবাদর্শে কেন আমরা উন্নয়ন নীতি তৈরী করবো?

৫। বিশেষত ঃ জায়গায় জায়গায় নারীর অধিকার ও সুযোগ-সুবিধার কথা বলতে গিয়ে এতে অহেতুক মারমুখী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

ইসলাম নারীর বিরুদ্ধে নয়

একটি বিষয় লক্ষনীয় যে, প্রকৃত ধর্মপরায়ন কোন ব্যক্তি দ্বারা কখনো কোন নারী নির্যাতিত না হয়, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক। বিশেষতঃ ইসলাম নারীকে সর্বোচ্চ সম্মান ও যথাযথ অধিকার দিয়েছে এবং সমাজে তার যৌক্তিক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছে ও তার অবদানের অকুণ্ঠ স্বীকৃতি প্রদান করেছে- সাথে সাথে করেছে তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা।

এর বিপরীতে যারা অধার্মিক-তারা নারীকে ভোগ্যপণ্য ও বিলাসিতার বস্তুতে পরিণত করার অপচেষ্টা করছে।

কেমন হওয়া উচিৎ উন্নয়ন নীতি

মানুষ সামাজিক জীব, অন্য দিকে প্রকৃতির অংশ। তাই মানুষকে জীবনধারণ, বেঁচে থাকা ও অস্তিত্ব রক্ষার জন্য প্রাকৃতিক ও সামাজিক উভয় বিধানই মেনে চলতে হবে। প্রাকৃতিক বিধান লঙ্ঘন করলে ধ্বংস অনিবার্য, আর সামাজিক বিধান ভঙ্গ করলে নেমে আসে বিপর্যয়।

সামাজিক নিয়মগুলো প্রকৃতি হতে মানুষের লব্ধজ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে গড়ে ওঠে। সামাজিক বিধানসমূহের মধ্যে ধর্মীয় বিধানই শ্রেয়। যেখানে আমাদের সামাজিক প্রেক্ষাপটে সন্তান বাবা অপেক্ষা মাকে বেশী শ্রদ্ধা করে, বেশী অনুগত থাকে; যেখানে স্বামীরা স্ত্রীর জন্য ভালোবাসার তাজমহল রচনা করে; যেখানে ভায়েরা বোনের ইজ্জত-আব্রু ও আব্দার রক্ষায় নিজেকে বিলিয়ে দেয়; যেখানে বাবারা কণ্যাসন্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়- সেখানে উন্নয়ন নীতি হবে 'প্রবাহমান সামাজিক মূল্যবোধ ও বিদ্যমান ধর্মীয়

চেতনাকে শানিত করা'। এবং সাম্যের বিধান ইসলাম নারীকে যে ন্যায্য অধিকার দিয়েছে- তা যথাযথভাবে আইনে রূপদান করে পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা।

এ বিষয়টি বর্তমানে দিবালোকের মতো পরিষ্কার যে, "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি" দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঃ

১। সুকৌশলে ইসলামের উপর আঘাত করা।

২। মুসলিম জাতিকে অনৈসলামী সমাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা।

৩। যুবসমাজকে বিবাহে নিরুৎসাহিত করে ব্যভিচার ও পাপাচারের পথে ঠেলে দেয়া।

৪। ইসলামী মূল্যবোধকে ভূলুণ্ঠিত করা।

৫। আমাদের হাজার বছরের সংস্কৃতি- যা দেশীয় ভাবধারায় লালিত এবং ইসলামী ভাবাদর্শে পরিশীলিত- তা বিনষ্ট করে সমাজে বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার প্রসার ঘটানো।

৬। আমাদের নিজস্ব স্বকীয়তা ধ্বংস করে পরাশ্রয়ী করে তোলা।

বর্তমান সরকারের কাছে আমাদের দাবী

উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে বাস্তবতার আলোকে সরকারের একমাত্র করণীয় হলো জনগণের দাবী মেনে নিয়ে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বিষয়গুলো বাতিল ঘোষনা করা। এবং আমাদের জাতিসত্বার সাথে সামঞ্জস্যশীল, সামাজিক মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ও ধর্মীয় চেতনা নির্ভর 'নারী উন্নয়ন নীতি' পূনঃ তৈরী করা ও ঘোষনা করা।

পরিশেষে তথাকথিত মানবতাবাদী ও নারীবাদীদের প্রতি আমাদের আহ্বান- "আসুন, আমরা ইসলাম নারীকে কী অধিকার দিয়েছে- তা জানি এবং দেশ ও জাতির কল্যাণে তা বাস্তবায়নে প্রয়াসী হই। নিজ স্ত্রীদের ও স্বীয় পুত্রবধূদের মহর আদায় করে দেই। বোনদের প্রাপ্য অংশ প্রদান নিশ্চিত করি। নারীর প্রকৃত স্বার্থের অনুকূল ইসলামের আলাকে নীতিমালা ও যথাযথ আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সরকারসহ সকল প্রতিষ্ঠানকে সহযোগিতা করি এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে তা বাস্তবায়ন করি। মহান আল্লাহ সকলের কল্যাণ করুন। আমীন।

sahihaqeedah.com

Sunni-Encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

তাসাউফ (সূফীতত্ত্ব)

মূল ঃ শায়খ হিশাম কাব্বানী (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র)

অনুবাদ ঃ কাজী সাইফুদ্দীন হোসেন

"রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সময় তাসাউফ ছিল একটি বাস্তবতা। কিন্তু তার কোনো নাম ছিলনা। আজকে তাসাউফ হলো একটি নাম, কিন্তু এর বাস্তবতা সম্পর্কে খুব কম মানুষই জানেন।

বর্তমান মুসলিম জাতির জন্য প্রয়োজন এমন সুজ্ঞানী ব্যক্তিত্বদের- যারা ইসলামের সঠিক শিক্ষা অনুশীলন করেন (আলিম ও আমিল) যুগে যুগে ক্ষয়ে যাওয়া ইসলামী মূল্যবোধ ও সভ্যতা সংস্কৃতি পুনঃ প্রতিষ্ঠায় যারা সাধ্যানুযায়ী সচেষ্ট এবং যারা হক (সত্য) ও বাতেলের (মিথ্যার) মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ে সক্ষম, আর যারা হক্ক -এ বিশ্বাস করেন ও বাতেলের বিরুদ্ধাচারণ করেন- আল্লাহর পথে তারা কাউকে ভয় করেনা।

আজকের মুসলমান সমাজকে সত্য ও সঠিক পথের দিকে, ধর্মের শিক্ষার দিকে পরিচালনা করার মতো আলেমের সংখ্যা নেই বল্লেই চলে। পক্ষান্তরে আমরা এমন কিছু আলেমের দেখা পাই- যারা ইসলাম সম্পর্কে জানার ভান করেন, অথচ ইসলামের নামে সবার ওপর নিজেদের ভ্রান্ত ধ্যান ধারণা চাপিয়ে দেবার চেষ্টায় রত থাকেন। তারা সকল সভা সমিতি ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগদান করেন এবং নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আলোকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে লেকচার ও বয়ান দেন। এ ধরনের বক্তব্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সাহাবীদের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয়, ইসলামের মহান ইমামদের সাথেও নয়, অধিকাংশ মুসলমানদের ঐকমত্যের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

আলেম উলামা যদি নিজেদের বিবেকের কথা শুনতেন ও ইসলামের প্রতি অনুগত ও নিষ্ঠাবান হতেন, আর অর্থের জোরে মুসলমান দেশগুলোকে নিয়ন্ত্রণকারী বিভিন্ন সরকার ও শক্তিগুলোর প্রভাবমুক্ত হয়ে শুধু দাওয়াত ও ইরশাদের (প্রচার) কাজে নিয়োজিত হতেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর স্মরণে মশগুল থাকতেন, তাহলে ইসলামী বিশ্বের পরিস্থিতি ও চেহারা পাল্টে যেতো এবং মুসলমানদেরও প্রভূত উন্নতি সাধিত হতো। আমরা আশা করবো, মহানবীর সুন্নাহ ও শরীয়তকে প্রতিষ্ঠা করতে সারা বিশ্বের মুসলমান একতাবদ্ধ হয়ে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আকড়ে ধরবেন।

ইতিহাসকে গভীরভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে যে, সাহাবায়ে কেরামের কঠিন পরিশ্রমের পরে পৃথিবীতে ইসলাম ধর্মের প্রচার প্রসার (দাওয়াত ও ইরশাদ) ঘটেছিল তাসাউফ (সূফীবাদ) -এর জ্ঞানী বুযুর্গানে দ্বীন ও তাঁদের অনুসারীদের মাধ্যমে- যারা মহানবীর খলিফাবৃন্দের সঠিক পথের অনুসারী ছিলেন। তারা প্রকৃত সূফীবাদের আলেম ছিলেন- যে সূফী মতবাদ কুরআন ও হাদীসের শিক্ষাসমূহ সমুন্নত রেখেছে এবং তা থেকে বিচ্যুত হয় নি।

ইসলামী যুহদ (কৃচ্ছতা সাধন) প্রথম হিজরী শতকে বিকশিত হয়েছিল এবং বিভিন্ন তরীকায় পরিনত হয়েছিল। এসব তরীকার ভিত্তি ছিল কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং এগুলো প্রচার করতেন যাহেদ উলামায়ে কেরাম- যারা পরবর্তীকালে সূফী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। এদের মধ্যে রয়েছেন প্রথম চার ইমাম, যথা- ইমাম আবু হানিফা (রহঃ), ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহঃ), আরও রয়েছেন ইমাম আবু আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ আল বুখারী (রহঃ), আবুল হুসাইন মুসলিম বিন আল হাজ্জাজ (রহঃ), আবু ঈসা তিরমিযী (রহঃ) প্রমূখ। অতঃপর যারা আগমন করেছেন- তাদের মধ্যে রয়েছেন- ইমাম হাসান আল বসরী (রহঃ), শায়খ জুনাইদ বাগদাদী (রহঃ), ইমাম আওযায়ী (রহঃ)। এদের পরে এসেছেন আত তাব্‌রাণী (রহঃ), ইমাম জালালউদ্দীন সুয়ূতী (রহঃ), ইবনে হাজর আল হায়তামী (রহঃ), আল জর্দানী, আল জওযী, ইমাম মহিউদ্দীন বিন শারফ বিন মারী বিন হাসান বিন হুসাইন বিন হাযম বিন নববী (রহঃ), ইমাম আবু হামিদ গাযালী (রহঃ), সৈয়দ আহমদ ফারুকী

সিরহিন্দী- প্রমূখ। এসব যাহেদ আলেম তাদের আনুগত্য, নিষ্ঠা ও অন্তরের পরিশুদ্ধির কারণে সূফী হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন এবং তাদের চেষ্টার ফলেই মুসলিম বিশ্ব আজ ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানতে পেরেছেন।

আমরা এ তথ্যটি গোপন করতে চাই না যে, ঐ সময় কিছু ইসলামের শত্রু সীমা লংঘন করে সূফীবাদের নামে ও সূফী হবার ভান করে প্রকৃত সূফী দর্শনকে ধ্বংস করার অসৎ উদ্দেশ্যে এবং মুসলমানদের মনকে সূফী দর্শনের প্রতি তিক্ত করার লক্ষ্যে নিজেদের মনগড়া মতবাদ পরিবেশন করেছিল। উল্লেখ্য যে, ওই সময় সূফী মতবাদ মুসলমানদের মধ্যে মুলধারা ছিল। প্রকৃত তাসাউফ যুহদ ও এহসান (অন্তরের পবিত্রতা) - এর উপর ভিত্তিশীল। মুসলিম বিশ্বের মহান ইমামবৃন্দ যাদেরকে সকল মুসলমান দেশে অনুসরণ করা হতো, তারা সূফীগুরু হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ইমাম মালেক (রহঃ), ইমাম আবু হানিফা (যার শিক্ষক ছিলেন ইমাম জাফর সাদেক (রহঃ)। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহম্মদ ইবনে হাম্বল (যার মুরশিদ ছিলেন বিশর আল হাফী) সকলেই তাসাউফকে আঁকড়ে ধরেছিলেন।

মুসলমান দেশেগুলোর সকল বিচারালয় ও বিশ্ববিদ্যালয় অদ্যাবধি এই চার ইমামের মযহাবগুলোর শিক্ষার ওপর নির্ভর করে। উদাহরণ স্বরূপ, মিসর, লেবানন, জর্দান, ইয়েমেন, জিবুতি ও আরও কিছু দেশ শাফেয়ী মযহাব অনুসরণ করে। সুদান, মরক্কো, তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, মৌরিতানিয়া, লিবিয়া ও সোমালিয়া মালেকী মযহাবের অনুসারী। সৌদি আরব, কাতার, কুয়েত, ওমান এবং আরও কিছু দেশ হাম্বলী মযহাব অনুসরণ করে। তুরস্ক, পাকিস্তান, ভারত, বাংলাদেশ, শ্রীলংকা এবং মধ্যএশিয়ার কিছু মুসলমান প্রজাতন্ত্রের দেশে হানাফী মযহাব অনুসরণ করা হয়। দক্ষিন পূর্ব এশিয়ার মুসলমান দেশগুলোতে শাফেয়ী মযহাবকে অনুসরণ করা হয়। মুসলমান দেশগুলোর বিচারালয়ের অধিকাংশই এই চার মাযহাবের ফতোয়া অনুযায়ী চলে। আর এই চার মযহাবের সবগুলোই তাসাউফকে গ্রহণ করে নিয়েছিল।

ইমাম মালেক (রহঃ) -এর একটি বিখ্যাত বাণী আছে, তিনি বলেন, "মান তাসওয়াফা ওয়ালাম ইয়াতাফাক্বাহা- ফাকাদ তাযানদাক্বা, ওয়ামান তাফাক্বাহা ওয়ালাম ইয়াতা সাওয়াফ- ফাকাদ তাফাসাক্বা, ওয়ামান তাসাওয়াফা ওয়া তাফাক্বাহা- ফাকাদ তাহাক্বাকা"।

অর্থাৎ-"যেব্যক্তি ফেকাহ ছাড়া তাসাউফ শিক্ষা করে, সে যিনদিক তথা গোমরাহ ও পথভ্রষ্ট হয়, আর যেব্যক্তি তাসাউফ বাদ দিয়ে ফেকাহ শিক্ষা করে, সে ফাসিক গুনাহগার হয়, কিন্তু যে ব্যক্তি তাসাউফ ও ফেকাহ দুটোই শিক্ষা করে, সে সত্য ও ইসলামের বাস্তবতাকে খুজে পায়"।

ভ্রমন করা যখন সবচেয়ে কঠিন ছিল- এমনি এক সময়ে ইসলামধর্ম সূফী পর্যটকদের নিঃস্বার্থ প্রচেষ্টায় দ্রুত প্রসার লাভ করে, এই সূফীবৃন্দ এতো মহান কাজের জন্যে আল্লাহর পছন্দকৃত বান্দা হবার শর্ত যুহদ আদ দুনইয়া (কৃচ্ছকৃত)তে সুশিক্ষিত হয়ে গড়ে উঠেছিলেন। তাদের জীবনই ছিল দাওয়াত, আর তাদের খাদ্য ছিল রুটি ও পানি। তাদের এই সংযম দ্বারা ইসলামের আশীর্বাদে তারা পশ্চিম থেকে দূর প্রাচ্যে পৌছেছিলেন। হিজরী ৬ষ্ঠ ও ৭ম শতাব্দীতে সূফীগুরুদের প্রচেষ্টা ও অগ্রগতির ফলে তাসাউফ ক্রমান্বয়ে বিকাশ লাভ করে। প্রতিটি সূফী তরীকা তার মুরশিদের নামে পরিচিত লাভ করে- যাতে করে অন্যান্য তরীকা থেকে তাকে পৃথকভাবে চেনা যায়। একইভাবে আজকে প্রত্যেক ব্যক্তি যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করেন, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী নিজ নামের সাথে বহন করেন। এটা নিশ্চিত যে, ইসলামধর্ম একই থাকে, এক সূফীপীর থেকে অন্য সূফীপীরে কখনো পরিবর্তিত হয় না, ঠিক যেমন ইসলাম এক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তিত হয় না।

তবে, অতীতে শিক্ষার্থীরা (মুরিদরা) তাদের পীরের উন্নত নৈতিকতা ও আচার ব্যবহারে প্রভাবিত হতেন। সে কারণে তারা একনিষ্ঠ ও অনুগত ছিলেন। কিন্তু আজকে আমাদের আলেম উলামা সেই ধরনের দিক নির্দেশনা দিতে অক্ষম এবং তাদেরকে ইসলাম সম্পর্কে লিখতে হচ্ছে অমুসলিম বিশ্ববিদ্যায়ে, অমুসলিম শিক্ষকদের কাছ থেকে।

সূফীগুরুগণ তাদের মুরিদদেরকে বলতেন- আল্লাহ তালাকে স্রষ্টা হিসেবে এবং তাঁর রাসূলকে তাঁরই হাবীব ও নবী হিসেবে গ্রহণ করতে। আরও নির্দেশ দিতেন- একমাত্র আল্লাহতালার এবাদত করতে এবং মূর্তিপূজা পরিহার করতে, খোদাতালার কাছে তওবা করতে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ অনুসরণ করতে, নিজেদের অন্তর পরিশুদ্ধ করতে, যাবতীয় ভুল ত্রুটি থেকে নিজেদের সত্তাকে পরিচ্ছন্ন করতে এবং আল্লাহর একত্বে তাদের বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করতে। মুরিদবৃন্দকে তারা শিক্ষা দিয়েছিলেন- যাতে সকল কাজে তারা সৎ ও আস্থাবাজন হন, আর ধৈর্যশীল ও খোদাকে ভয়কারী হন, যাতে তারা খোদার উপর নির্ভর করেন এবং সকল সৎগুণাবলীর অধিকারী হন, যা ইসলাম দাবি করে। উন্নত চরিত্রই সাফল্যের চাবি কাঠি।

আন্তরিকতা ও পবিত্রতার এসব মকাম অর্জনের উদ্দেশ্যে সূফীপীরবৃন্দ তাদের মুরিদদেরকে বিভিন্ন দোয়া কালাম শিখিয়েছিলেন- যা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীনবৃন্দের আমল ছিল। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন যিকরুল্লাহ- তথা আল্লাহর স্মরণ, কুরআন পাঠের মাধ্যমে, দোয়া ও তাসবীহ হাদীস শরীফ হতে, আর আল্লাহর নাম ও সিফাত (গুণ) তসবীহ, তাহলীল, তাকবীর ও তামজীদ -এর মাধ্যমে তারা শিক্ষা দিয়েছিলেন। এগুলো যিকর সম্পর্কিত বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস দ্বারা সমর্থিত (সহীহ বুখারী, মুসলিম, তাবরানী, ইবনে মাজাহ, আবু দাউদ ইত্যাদি হাদীসের গ্রন্থে "ইসলামে যিকর" শীর্ষক অধ্যায়ে এগুলো পাওয়া যায়)।

এ সকল সূফী মুরশিদ (প্রকৃত আলেম উলামা) খ্যাতি ও উচ্চপদ, অর্থবিত্ত ও বস্তুবাদী জীবনকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তারা আমাদের যমানার আলেম উলামার মতো ছিলেন না, যারা যশ প্রতিপত্তি ও অর্থ বিত্তের পেছনে ছুটছেন। বরঞ্চ তারা ছিলেন দুনিয়াত্যাগী যাহেদ ও আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল, যেমনিভাবে কুরআনে তিনি আদেশ করেছেন- মা খালাকতুল জিন্না ওয়াল ইনসা ইল্লা লি ইয়া' বুদুন। অর্থাৎ আমি জ্বিন ও ইনসান (মানব) জাতি দুটোকে সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র আমার এবাদত করার উদ্দেশ্যে।

সূফীবৃন্দের শিষ্টাচার ও যুহদের ফলে তারা ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছিলেন। তাঁরা মুসলিম জাহানে মসজিদ ও খানকাহ নির্মাণ করতেন। বস্তুতঃ এখানে গরীবদের ফ্রি থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতিতে খানকাহ ও মসজিদের মাধ্যমে ইসলামধর্ম একদেশ থেকে আরেক দেশে প্রসার লাভ করে। এসব আশ্রয়কেন্দ্র- যেখানে গরিব মানুষেরা খেতে পেতো ও ঘুমোতো পারতো এবং আশ্রয়হীনরা মাথা গুজবার ঠাঁই পেতো, সেগুলো ছিল গরিবদের অন্তরের জন্যে নিরাময় স্বরূপ। সেগুলো আরও ছিল ধনী ও গরিবের সাদা ও কালো, হলুদ ও লাল বর্ণের মানুষের, আরব ও অনারবের সম্পর্ক সুদৃঢ় করার এবং একাত্ম হবার স্থান।

হযরত রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি হাদীসে এরশাদ ফরমান- "আরব ও অনারবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই, শুধু হক- তথা সত্য ও ন্যায় দ্বারাই পার্থক্য করা হবে"।

এসকল খানকাহ পৃথিবীর সমস্ত জাতি গোষ্ঠীর মানুষের জন্যে সম্মেলনস্থলে পরিণত হয়। সূফীবৃন্দ সুন্নাহ ও শরীয়তকে সমুন্নত রেখেছিলেন। তাদের ইতিহাস হলো আল্লাহর রাস্তায় সংগ্রাম (জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ) করার সাহসিকতায় ভরা, নিজেদের দেশ ছেড়ে মানুষের মন জয় করার ও ভালবাসা দিয়ে তাদেরকে আল্লাহর রাস্তায় আনার সংগ্রাম। তারা জাতি-গোষ্ঠী ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে ভালবেসে ছিলেন। তারা সবাইকে সম্মান করেছেন, বিশেষ করে অবহেলিত নারী সমাজ ও গরিব দুঃস্থ মানুষকে। সূফীবৃন্দ ছিলেন পৃথিবীতে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো, সর্বত্র দেদীপ্যমান। তারা সবাইকে জেহাদ ফী সাবিলিল্লাহ- তথা আল্লাহর রাস্তায় কঠিন সাধনা করতে উৎসাহিত করেছিলেন, ইসলাম প্রচার প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, গরিবদেরকে সাহায্য করতে বলেছিলেন। তারা ঈমানী দাওয়াত পৌঁছে দিয়েছিলেন মধ্যএশিয়া থেকে ভারত, পাকিস্তান, তাশখন্দ, বোখরা, চীন, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো অন্যান্য অঞ্চলে।

প্রকৃত সূফীবৃন্দ কখনোই সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম -এর শরীয়ত ও সুন্নাহ থেকে এবং কুরআন মজীদ থেকে বিচ্যুত হন নি, যদিও কিছু সূফী জযবা হালতে- তথা ঐশী ভাবোন্নত্ত অবস্থায় কিছু উক্তি করেছেন এবং আল্লাহর মাহাত্ম্য ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

তাসাউফের প্রধান বা মূল দুটি উৎস ছিল কুরআন মজীদ ও সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর সুন্নাহ, যা সাইয়্যেদুন্না হযরত আবু বকর (রাঃ) ও সাইয়্যেদুনা হযরত আলী (কঃ) -এর ইসলাম উপলব্ধির মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে। এই দু'জন সাহাবীকে সূফী তরিকাহ সমূহের উৎস মূল বিবেচনা করা হয়। হযরত আবু বকর (রাঃ) তাসাউফের একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তার সম্পর্কে সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমান-"মা সাব্বাল্লাহু ফী সাদরী শাইয়ান- ইল্লা ওয়া সাব্বাবতুহু ফী সাদরী আবি বাকরিন"। অর্থাৎ- "আল্লাহপাক যাকিছু আমার অন্তরে ঢেলেছেন- তার সবই আমি আবু বকরের (রাঃ) অন্তরে ঢেলেছি" (হাদিকাতুন নদীয়া, কায়রো হতে প্রকাশিত, ১৩১৩ হিজরী, পৃষ্ঠা ৯)। আল্লাহ তা'লা কুরআন মজীদে এরশাদ ফরমান "তবে নিশ্চয় আল্লাহ তাঁকে (নবী করিম) সাহায্য করেছেন- যখন কাফেরদের ষড়যন্ত্রের কারণে তাঁকে বাইরে তাশরীফ নিয়ে যেতে হয়েছে, একজন ছাড়া তাঁর আর কোনো সঙ্গী ছিল না- তাঁরা দুজনই গুহার মধ্যে ছিলেন" (সুরা তাওবা, ৪০ নং আয়াত)।

রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি হাদীস শরীফে এরশাদ ফরমান- "আম্বিয়া (আঃ) ছাড়া আবু বকরের (রাঃ) মতো আর কারো উপর সূর্য এমনভাবে উদিত হয়নি"। (ইমাম সুয়ুতী রচিত খলিফাদের ইতিহাস, কায়রো, ১৯৫২, পৃষ্ঠা ৪৬)।

হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রাঃ) -এর মকাম (মর্যাদা) ব্যাখ্যাকারী আরও অনেক হাদীস আছে। তাসাউফের অপর ধারাটি সাইয়্যেদুনা হযরত আলী (কঃ) -এর মাধ্যমে এসেছে, তার সম্পর্কে বহু হাদীস বর্ণিত হয়েছে- যা ব্যাখ্যা করতে অনেক পৃষ্ঠা ব্যয় হবে। পরিশেষে, সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নাহ্ ও শরীয়ত- যা ফরয (অবশ্য কর্তব্য) ও এহসান (আধ্যাত্মিকতা) এর প্রতিনিধিত্ব করে এবং সুন্দর আচার ব্যবহারের ও প্রতিনিধিত্ব করে, তা সূফী বুযূর্গদের চরিত্রে মূর্ত প্রকাশিত ছিল।

হিজরী ১৩ শতাব্দীতে একটি নতুন গোষ্ঠীর (ওহাবী) আবির্ভাব ঘটে- যারা ৭ম হিজরীর দুজন আলেমের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এরা নিজেদেরকে হাম্বলী মযহাবের অনুসারী দাবি করলেও তাদের আকিদা বিশ্বাস ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। এরা তাসাউফ সম্পর্কে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে এবং চার মাযহাব থেকে বিচ্যুত হয়। (এরাছিল ইবনে তাইমিয়া ও ইবনে কাইয়েম)।

সাম্প্রতিক কালে ঐ নতুন গোষ্ঠীর অনুসারীরা সীমা লংঘন করে তাদের আধুনিক যুগের গুরুদের (বিন বাজ ও আলবানী) ফতোয়ার উপর ভিত্তি করে মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করছে। এইসব গোষ্ঠীপ্রধান নিজেদের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ফতোয়া প্রদান করে মুসলমানদের মূলধারা থেকে বিচ্যুত হয়েছে। বর্তমানে এরাই সূফীতত্ত্বের বিরুদ্ধে লড়াই আরম্ভ করেছে এবং বিগত ১৩০০ বছর যাবত ইসলাম প্রচার প্রসারে সূফীদের সমস্ত অবদানকে মুছে ফেলতে চাচ্ছে।

আমাদের মুসলমান ভাই বোনদের জ্ঞাতার্থে আমরা বিভিন্ন মুসলিম দেশের অগনিত সূফী তাত্ত্বিকদের মধ্য থেকে কয়েকজনের নাম এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

১। মিসরীয় মুফতী হাসসানাইন মোহাম্মদ আল মুখলুফ, মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগের সদস্য।

২। মোহাম্মদ আত তাইয়েব আন নাজ্জার, সুন্নাহ এন্ড শরীয়াহ ইন্টারন্যাশনালের সভাপতি এবং আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাপতি।

৩। শায়খ আব্দুল্লাহ কানুন আল হাসসানী, মরক্কোর উলামা সংস্থা প্রধান এবং ওয়ার্ল্ড ইসলামিক লীগের ডেপুটি।

৪। ড. হুসাইনী হাশিম, মিসর আল আযহারের ডেপুটি এবং মক্কার রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের মহাসচিব।

৫। সাইয়্যেদ হাশিম আল রেফাঈ, কুয়েত সরকারের সাবেক ধর্মমন্ত্রী।

৬। শায়খ সাইয়্যেদ আহমদ আল আওয়াদ, সুদানের মুফতী।

৭। উস্তায আবদুল গফুর আল আত্তার, সৌদি আরব লেখক সমাজের সভাপতি।

৮। কাযী ইউসুফ বিন আহমদ আস সিদ্দিকী, বাহরাইনী হাই কোর্টের জজ।

৯। মোহাম্মদ খাযরাজী, শায়খ আহমদ বিন মোহাম্মদ বিন যাবারা, ইয়েমেনের মুফতী।

১০। শায়খ মোহাম্মদ শাধিলী নিভার, তিউনিশিয়ার শরীয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট।

১১। শায়খ খাল আল বানানী, মৌরিতানিয়ার ইসলামিক লীগের সভাপতি।

১২। শায়খ মোহাম্মদ আবদুল ওয়াহিদ আহমদ, মিসরের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী।

১৩। শায়খ মোহাম্মদ বিন আলী হাবাশী, ইন্দোনেশিয়ার ইসলামিক লীগ সভাপতি।

১৪। শায়খ আহমদ কোফতারো, সিরিয়ার মুফতী।

১৫। শায়খ আবু সালেহ মোহাম্মদ আল ফাতিহ আল মালেকী, ওনদুরমান, সুদান।

১৬। শায়খ মোহাম্মদ রাশিদ কাব্বানী, লেবাননের মুফতী।

১৭। শায়খ সাইয়্যেদ মোহাম্মদ মালেকী আলভী আল হাসানী, শরীয়ার অধ্যাপক এবং মক্কা ও মদীনার দুটো পবিত্র মসজিদের শিক্ষক, (বর্তমানে ইনতিকাল প্রাপ্ত-অনিল)।

এবং আরো অগনিত সূফীবাদী হক্কানী উলামায়ে কেরাম।

ওহে আমাদের মুসলমান ভাই ও বোনেরা! ইসলাম হলো সহিষ্ণুতা (হিলম), ভালবাসা, শান্তি। ইসলাম হলো বিনয়, পূর্ণতা। ইসলাম হলো যুহুদ, এহসান। ইসলাম মানে সুসম্পর্ক। ইসলাম মানে পরিবার, ভ্রাতৃত্ব। ইসলাম মানে সাম্য। ইসলাম হলো একটি দেহ। ইসলাম হলো জ্ঞান, আধ্যাত্মিকতা। ইসলামের বাহেরী (প্রকাশ্য) ও বাতেনী (অপ্রকাশ্য) জ্ঞান রয়েছে। ইসলামের অপর নাম বেলায়াত ও সূফীবাদ, আর বেলায়াত ও সূফীবাদই হলো ইসলাম।

পরিশেষে বলবো- ইসলাম ধর্ম হলো আমাদের প্রতি আল্লাহতালার প্রেরিত আলো- যা তিনি সর্বশেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম -এর মাধ্যমে পাঠিয়েছেন। এই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন ভালবাসার ও যাহেরী বাতেনী জ্ঞানের মূর্ত প্রতীক, সকল মানবের জন্যে তিনি করুণার প্রতীক। তিনি খোদার সাথে আমাদের মধ্যস্থতাকারী, সবার জন্যে তিনি শাফায়াতকারী- যে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই।

আল্লাহ তা'লা আমাদের এ লেখায় ভুলত্রুটি হলে মাফ করুন, আমিন।

এ লেখাটি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধ লেখক ঐ ফাউন্ডেশনের সভাপতি।

ফাতেহায়ে এয়াজদাহুম উপলক্ষে সুন্নী সম্মেলন

স্থান : রানীদিয়া, সরাইল, বি-বাড়ীয়া।
তারিখ : ২৩ মার্চ বুধবার বাদে মাগরিব হতে

প্রধান অতিথি :
হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন, খতীব, গাউসুল আজম জামে মসজিদ, শাহ্জাহানপুর, ঢাকা।

বিশেষ অতিথি :
হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম জালালী, খলিফা, আমিয়াপুর দরবার শরীফ।

উদ্বোধক : আলহাজ্ব আবদুর রব সাহেব, ঢাকা।

নিবেদক : মুহাম্মদ রইছ উদ্দীন
০১৭৩২৬৫৪৮৩০

১২ মার্চ আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত কর্তৃক আয়োজিত আ'লা হযরত কনফারেন্স ও অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)-এর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত

বিশেষ রিপোর্ট : গত বছরের ন্যায় এবারও অনুষ্ঠিত হলো আ'লা হযরত কনফারেন্স ও অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ) এর স্মরণ সভা ২০১১ আয়োজন করেছিল অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিলের নেতৃত্বে লালিত আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত, বাংলাদেশ। শাহ্‌জাহানপুরস্থ মাহবুব আলী ইনষ্টিটিউট মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত সংগঠনের বর্তমান প্রেসিডেন্ট এডভোকেট ডঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন- আল্লামা মাওঃ হাফেজ আবদুল হামিদ আল-কাদেরী, অধ্যাপক আলহাজ্ব এম এ হাই, ডঃ জালাল আহমেদ, পীরে তরিকত হযরত মাওঃ ছদরুল আমিন রেজভী, মাওঃ মোবারক হোসেন ফরাজী, মুফতি মাওঃ ফারুখ আহম্মদ আল-কাদেরী, এডভোকেট দেলোয়ার হোসেন পাটোয়ারী আশরাফী, অধ্যক্ষ মাওঃ ডঃ মোঃ আবদুল আউয়াল, আলহাজ্ব মোহাম্মদ ইকবাল, আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোহাম্মদ আবুল হাশেম, এডভোকেট মোশারফ হোসেন, আলহাজ্ব আবদুল মালেক। এছাড়া বিভিন্ন জেলা ও গাউছুল আযম জামে মসজিদের পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ, আহলে সুন্নাতের একনিষ্ঠ কর্মীবৃন্দ ও বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ।

সকাল ১০ টা থেকে ২টা পর্যন্ত একটানা অনুষ্ঠান চলে। ওয়াজ নসিয়ত ও আ'লা হযরত এবং অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)-এর জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং তাদের আদর্শকে ধারণ করে সুন্নী জামাতকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহবান জানান উপস্থিত বক্তারা। বক্তারা আ'লা হযরত আহমদ রেযা খান (রাঃ) ও অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)-এর প্রদর্শিত পথে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার জন্যে উপস্থিত সকলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতকে সুদৃঢ় করে সুন্নী আন্দোলনকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দৃপ্ত কণ্ঠে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। প্রতিটি জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত (বাংলাদেশ)-এর শাখা গঠনের আহবান জানান সংগঠনের বক্তারা।

সভাপতির বক্তব্যে এডভোটেক ডঃ আজিজুর রহমান চৌধুরী সাহেব বলেন সারা বাংলার পীর মাশায়েখ, সুন্নী ওলামাবৃন্দ ও সুন্নী প্রতিনিধিদেরকে সুসংগঠিত হয়ে সুন্নী আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্যে এগিয়ে আসার উদাত্ত আহবান জানান।

দপ্তর সচিব জনাব মোহাম্মদ আবুল হাশেম অধ্যক্ষ হাফেয মুহাম্মদ আবদুল জলিল (রাঃ)-এর জীবদ্দশায় ২০০৩ সালের যে আলা হযরত একাডেমী প্রতিষ্ঠার ঘোষনা করেছিলেন সেটি পুনর্জিবীত করার জন্যে সকলের প্রতি আহবান জানান। এবং উপস্থিত প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন বিপুল হর্ষ ধ্বনীর মাধ্যমে।

প্রচার সচিব আলহাজ্ব মোঃ ইকবাল সাহেবের পরিচালনায়, বাংলাদেশ যুবসেনাদের সহযোগিতায় এবং আলহাজ্ব মোঃ আবদুর রব, মোহাম্মদ আবুল হাশেম. এড্যাডভোকেট জালাল, মোঃ শাহ্‌জাহান, মোঃ মোশাররফ হোসেন, আলহাজ্ব আবদুল মালেক ও সেকান্দর সুমনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সুশৃংখলভাবে সুন্নী মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

অনতিবিলম্বে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত বাংলাদেশ আ'লা হযরত একাডেমী পুন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রাথমিক কার্যক্রম শুরু করা হবে ইনশাআল্লাহ। আতঃপর আ'লা হযরত আহম্মদ রেযা খান (রাঃ)-এর প্রসিদ্ধ মিলাদের কসিদা "মোস্তফা জানে রহমত পে লাখো ছালাম" পেশ করার মধ্য দিয়ে মুনাজাত-এর মাধ্যমে দেশের ও মুসলিম জাহানের মঙ্গল কামনা করা হয়। এবং সুন্নী আদর্শের ভিত্তিতে ইসলামী ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্যে বিশেষ দোয়া করেন পীরে, তরিকত আল্লামা হাফেয মাওঃ আবদুল হামিদ আল-কাদেরী, পীর সাহেব, মগবাজার।

প্রশ্নোত্তর (আক্বিদা ও আমল)

- মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ বখতিয়ার উদ্দীন

প্রশ্ন ঃ এক বক্তা বলেছেন আল্লাহর সূরতে হযরত আদম আলাইহিস সালাম পয়দা অন্য এক হুযুর বলেছেন- রাসূলের সূরতে পয়দা। কোনটি ঠিক?

উত্তর ঃ কোনটিই ঠিক নয়? আল্লাহর সূরত নেই- কেউ সূরত মানলে কাফের। আল্লাহর সুরত অর্থ আল্লাহর সিফাত। যেমন আলিম, ক্বাদির, ছামি, বাছির ইত্যাদি আল্লাহর সিফাত। হযরত আদম (অঃ)কে এই সিফাত বিশিষ্ট করে সৃষ্টি করা হয়েছে। অথবা হযরত আদমের বর্তমান সূরতেই তাঁকেই সৃষ্টি করা হয়েছে। অর্থাৎ ষাটগজ লম্বা, চুঁলদাঁড়ি ওয়ালা নওজোয়ান সূরতে তাঁকে সৃষ্টি করা হয়েছে। মৃত্যু পর্যন্ত কোন সূরত পরিবর্তন হয়নি। দেখুন মিরকাত ও হাশিয়াহ মিশকাত।

প্রশ্ন ঃ কোরআন ও অসংখ্য হাদীস দ্বারা নবীজীর ইলমে গায়েব প্রমাণিত। কিন্তু বাতিল পন্থীরা কোরআনের ছুরা আনআম ৫০ নং আয়াত দিয়ে বলে "নবীজী নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর ইলমে গায়েব ছিলনা।" তাই আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে চাই। **উত্তর ঃ** ছুরা আনআমের ৫০ আয়াতে এভাবে বলা হয়েছে-

قُلْ لَآ اَقُوْلُ لَكُمْ عِنْدِىْ خَزَآئِنُ اللّٰهِ لَآ اَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَآ اَقُوْلُ لَكُمْ اِنِّىْ مَلَكٌ۔

প্রকৃত অর্থঃ বলুন হে হাবীব! "আমি তোমাদের কাছে দাবী করিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার রয়েছে। আর দাবী করিনা যে আমি নিজে নিজে ইলমে গায়েব জানি। আর এ কথাও দাবী করিনা যে আমি একজন ফিরিস্তা"। (রূহুল বায়ান) এতে পরিস্কার হয়ে গেলো- "নবীজী নিজে নিজে ইলমে গায়েব জানেন বলে দাবী করেননি বরং আল্লাহ তাঁকে সমস্ত ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন। বাতিলপন্থীরা ইলমে নাহু ইলমে ছরফ না জানার ভান করে ভুল অর্থ করেছে। যথাঃ "আপনি বলুনঃ আমি বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ভান্ডার রয়েছে তা ছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি একথাও বলি না যে, আমি ফিরিস্তা"। (মাআরিফুল কোরআন)

দেখুন রূহুল বয়ানের ব্যাখ্যাও অনুবাদ এবং মা আরিফুল কোরআন এর অনুবাদের মধ্যে কত ব্যবধান। এই ভুল অনুবাদ পড়েই মানুষ গোমরাহ হচ্ছে। উক্ত আয়াত দ্বারা ওহাবীরা মানুষকে ধোঁকা দেয়। নবীজীর ইলমে গায়েবের প্রমাণ যে সমস্ত আয়াতে রয়েছে তন্মধ্যে একটি হলো-

وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔

অর্থাৎ "হে প্রিয় নবী। আপনার রব আপনাকে আপনার যাবতীয় ব্যাপক ইলমে গায়েব শিক্ষা দিয়েছেন (ছুরা নিসা ১১৩ আয়াত তাফসীরে জালালাইন)

ওহাবীরা ঐ পাঁচটি আয়াত গোপন করে ইহুদীতে পরিণত হয়েছে।

প্রশ্ন ঃ কোরআনের ছুরা বাক্বারার প্রথম তিনটি হরফ আরিফ-লাম-মীম এর অর্থ কী?

উত্তর ঃ তাফসীরে ইবনে আব্বাসে বলা হয়েছে- আলিফে আল্লাহ, লামে জিবরাঈল, মীমে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) অর্থাৎ কোরআন, হাদিছ, ছহিফা আল্লাহ প্রেরণ করেছেন। জিবরাঈল বহন করেছেন মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গ্রহণ করেছেন এবং ব্যাখ্যাসহ প্রচার করেছেন।

প্রশ্ন ঃ নামাযে দাঁড়ালে অনেক কিছু মনে পড়ে। এমতাবস্থায় নামায পড়লে কি হবে?

উত্তর ঃ নামাযে কুখেয়াল আসা স্বাভাবিক। এজন্য সূরা কিরাতের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। তাহলে কুখেয়াল কমে আসবে এবং একাগ্রতা বাড়বে। এরূপ খেয়াল আসলেও নামায হয়ে যাবে। ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নাত ঠিকমত আদায় করলে নামায হয়ে যাবে। কিন্তু কবুল হওয়ার জন্য একাগ্রতার প্রয়োজন। চেষ্টা করতে হবে যাতে কুখেয়াল আসতে না পারে।

প্রশ্ন ঃ মসজিদে মাইক দ্বারা আযান দেয়া, নামাজ পড়া, খুৎবা পাঠকরা এবং বৈদুত্যিক ফ্যান ব্যবহার করা যাবে কিনা?

রেজাউল করিম, তুলাতুলী, চান্দিনা, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ মসজিদে মাইক ব্যাবহার তথা মাইক এ আজান দেয়া, খোৎবা পড়া, নামাজ় পড়া, জিকির আজকার মিলাদ-কিয়াম দোয়া মুনাজাত ইত্যাদি অবশ্যই জায়েজ

বরং উল্লেখিত ইবাদত বন্দেগীর লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য ক্ষেত্রবিশেষে মাইক এর বিকল্প নেই। মাইক বিজ্ঞানের অবদান। আর বিজ্ঞানের মূল উৎস পবিত্র কুরআন। সর্বোপরী আল্লাহ্‌র সৃষ্টি জগতের সবকিছু মানবকল্যাণে নিবেদিত। যেমন- ইরশাদ হয়েছে-

خَلَقَ لَكُمْ مَافِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا.

অর্থাৎ- পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছু আল্লাহ তায়ালা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। সুতরাং আল্লাহ পাকের সৃষ্টি বস্তুকে আল্লাহর ইবাদতে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে যুক্তিযুক্ত।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি সবক্ষেত্রে প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। একসময় যেসব মসজিদে চল্লিশ- পঞ্চাশ জন মুসল্লি নামাজ আদায় করত সেসব মসজিদে বর্তমানে হাজার হাজার মুসল্লির সমাবেশ নিত্য নৈমিত্তিক ও স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশেষ করে শহরের মসজিদগুলো ৪/৫ তলা বিশিষ্ট করার পরও মুসল্লি সংকুলন হচ্ছেনা। এক্ষেত্রে সকল মুসল্লির কানে খুৎবার আওয়াজ, নামাজের তাকবির, কিরআত এবং সালামের আওয়াজ ঠিকমত না পৌছালে নামাজের মধ্যে মারাত্মক ব্যাঘাত সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং এহেন পরিস্থিতিতে নামাজের শৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য মাইকের বিকল্প নেই। অন্যথায়, মুসল্লিরা পড়ে যাবেন কঠিন পরিস্থিতিতে। অথচ মহান আল্লাহ কখনো চাননা বান্দা কষ্টে নিপতিত হোক। যেমন ইরশাদ হয়েছে يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. আল্লাহ্‌ তায়ালা তোমাদের জন্য সহজ পন্থার কামনা করেন। কখনো কাঠিন্যতা তিনি তোমাদের জন্য পছন্দ করেননা।

পবিত্র কুরআন-সুন্নাহর গবেষণার ফসল আধুনিক বিজ্ঞানের বধান্যতায় মানুষ যখন মহাশুন্যে পরিভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে ঠিক সেই সময়ে মসজিদে মাইক ব্যবহার করা যাবে কিনা এই বিষয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করা রীতিমত হাস্যকরও বটে। বরং এসব বিষয়ে প্রশ্নের অবতারনা করা বিশ্বের দরবারে ইসলামকে একটি সংকীর্ণ ধর্ম হিসেবে উপস্থাপন করার নামান্তর।

মসজিদে মাইক, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে বৈধ। নিম্নে ইসলামী আইন শাস্ত্রের কতিপয় নীতিমালা উপস্থাপন করার প্রয়াস পাচ্ছি।

১নং দলীল ঃ اَصْلُ الْاَشْيَاءِ اَلْاِبَاحَةُ.

অর্থাৎ- প্রত্যেক বস্তুর মৌলিক অবস্থা "বৈধ"। আল আশ্‌বাহ ওয়ান নাজায়ের, হেদায়া ইত্যাদি। হ্যাঁ বস্তুটি ব্যবহার করা কিংবা কোন কাজ হারাম (নিষিদ্ধ) হবার ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহ্‌র কোন দলীল পাওয়া গেলে তখন অবৈধ হবে। অন্যথায় সর্বাবস্থায় বৈধ। মসজিদে মাইক, বৈদ্যুতিক পাখা ইত্যাদি ব্যবহার হারাম হওয়ার ব্যাপারে যেহেতু কোন দলীল নেই সেহেতু তা জায়েজ হওয়াই ইসলামী আইনের বিধান।

অধিকন্তু মাইক ব্যবহারের ফলে ইবাদত অনেকটা সহজতর হয়ে যায়। যেমন মাইক ব্যবহারের কারণে ইমাম সাহেবের কুরআন তিলাওয়াত মুসল্লিরা সবাই শুনতে পায়। এতে একদিকে কিরাত শ্রবণের সওয়াব অর্জিত হয় অন্যদিকে মহান আল্লাহর নির্দেশের বাস্তবায়ন হয়। যেমন- ইরশাদ হয়েছে-

وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

অর্থাৎ- যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তোমরা মনদিয়ে শোন, আর নিশ্চুপ থাক যেন তোমাদের উপর রহমত বর্ষিত হয়। (সূরা আ'রাফ ২০৪)

তাফসীরকারকদের মতে উক্ত আয়াতে ইমামের কিরাত শ্রবণ করার জন্য মুসল্লিদেরকে বিশেষভাবে তাকিদ দেয়া হয়েছে। সুতরাং যেসব মসজিদে মাইক রয়েছে সেখানকার মুসল্লিরা উক্ত আয়াতের উপর আমল করা যতটুকু সহজ ও সম্ভব মাইকছাড়া মসজিদে তা আদৌ সম্ভব নয়।

দলীল নং-২ ঃ

مَارَاٰهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ حَسَنٌ.(الحديث)

অর্থাৎ- অধিকাংশ মুসলমান যে বিষয়কে ভাল ও উত্তম মনে করে তা মহান আল্লাহ্‌র নিকটও ভাল।

মাইক ও বৈদ্যুতিক পাখা আবিষ্কার বেশীদিনের নয় এগুলো নবীজির যুগেও ছিলনা সাহাবী তাবেয়ীর যুগেও ছিলনা। বরং হাজারো বছর পরে আবিষ্কার হয়েছে। আবিষ্কারের পর পরই ইবাদতে মাইক ও বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহার করা নিয়ে বিতর্ক শুরু হলে বিশ্বের বড় বড় ওলামায়ে কেরাম গবেষণা করে বৈধতার পক্ষে রায়

দিয়েছেন ফলে বর্তমান বিশ্বের মক্কা-মদীনা মিসর, সুদান, ইরাক, ইরানসহ সব দেশে বড় বড় মসজিদে মজলিশে মাইক ব্যবহার করা হয়। অবশ্য ছোট জামাতে মুকাব্বির যথেষ্ট। সেক্ষেত্রে মাইক ব্যবহারে যথেষ্ট নয়। মুকাব্বির যেহেতু সুন্নাত সেদিকটা লক্ষ্য করে মুকাব্বিরের কাছেও যদি একটি লাউড স্পিকার থাকে, তা ভাল হয়।

দলীল নং-৩ ঃ

اَلدِّيْنُ يُسْرٌ وَفِي رِوَايَةٍ يَسِّرُوْا وَلَاتُعَسِّرُوْا. الحديث

অর্থাৎ দ্বীন হলো সহজপন্থার নাম। অন্য হাদীসে রয়েছে- তোমরা সহজতা অবলম্বন করো; কঠিন পথ পরিহার করো (বুখারী ও মুসলিম ১ম খন্ড) উল্লেখ্য যে, হাজার হাজার মুসল্লির জামায়াতে মাইক ব্যবহার না করলে নামাজের শৃংখলা রক্ষা অনেকটা দু:সাধ্য। বিশেষকরে দ্বিতল ত্রিতল কিংবা বহুতল বিশিষ্ট মসজিদে মাইক ছাড়া ইমামের অনুসরণ কল্পনাই করা যায়না। সুতরাং এই কষ্ট দূরীকরণের জন্য মাইক ব্যবহারের বিকল্প নেই।

দলীল নং-৪ ঃ

উমদাতুর রিয়ায়া হাশিয়া শরহে বেকায়া ১ম খন্ড ১৩৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে-মুয়াজ্জিন তাঁর উভয়কানে দুই শাহাদত আঙ্গুলি রাখবে, কেননা এ ব্যাপারে স্বয়ং রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া ছাল্লাম হযরত বিল্লাল (রা:) কে নির্দেশ দিয়ে বলেন, এই পদ্ধতি তোমার আজানের আওয়াজকে বুলন্দ করবে। -ইবনে মাজাহ সূত্রঃ উমদাতুর রিয়ারা ১ম খন্ড, ১৩৪ পৃষ্ঠা।

সম্মানিত পাঠক! বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আওয়াজ বড় করার জন্য নবীজি হযরত বিলাল (র:) কে একটি পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। উল্লেখ্য যে, কানে আঙ্গুল দিয়ে আজান দিলে আওয়াজ বড় হয়, তার চেয়ে শতগুন বড় হয় মাইক ব্যবহার করলে।

আরো লক্ষ্য করুন, বিদায় হজের ভাষন দেয়ার সময় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রীর উপর আরোহন করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল আওয়াজ বড় করা। এখান থেকে ও বুঝা যায় আওয়াজ বড় করার যত মাধ্যম থাকতে পারে তা অবলম্বন করা নবীজির সুন্নাত। এবং সেই ধারা বাহিকতায় পরবর্তীতে আজানের জন্য সুউচ্চ মিনার তৈরী করা হয়েছিল। বর্তমানে মাইক তার চেয়ে উন্নততর ব্যবস্থা। মসজিদে গম্বুজ, মিনার ইত্যাদি যদি জায়েজ হয় তাহলে মাইকও জায়েজ হবে নিঃসন্দেহে।

ইসলামের প্রাথমিক যুগে বড় জামাতে মুকাব্বিরের যে ব্যবস্থা করা হয়েছিল তার উদ্দেশ্যও ছিল আওয়াজ সকল মুসল্লিদের কানে পৌছানো যা বর্তমানে আধুনিক বিজ্ঞানের আবিস্কার লাউড স্পিকার (মাইক) দ্বারা সহজে সম্ভব হচ্ছে সুতরাং মাইক ব্যবহার ইবাদতের প্রতিবন্ধক নয়; বরং সহায়ক।

আর মসজিদে বৈদ্যুতিক পাখা ব্যবহারের ব্যাপারে আপত্তি তোলা নিছক অঙ্গতা বৈকি। বৈদ্যুতিক পাখায় আগুনের স্পর্শ রয়েছে এই অযুহাতে কেউ মসজিদে তা ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষনা করলে তার জন্য ভাত খাওয়াও জায়েজ হবেনা। কারণ, ভাত রান্না হয় আগুন দ্বারা। কুরআন হাদীস, তাফসীর ইত্যাদি মহামূল্যবান কিতাবসমূহ ছাঁপানো যাবেনা। কারণ, ছাঁপাখানা সম্পূর্ণটাই বিদ্যুত তথা আগুন দ্বারা পরিচালিত।

প্রশ্ন ঃ ইয়া শায়খ সাইয়েদ সুলতান আবদুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ" বাক্যটি তাসাউফ পন্থীদের কাছে অনেক প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হলেও কোন কোন মহল থেকে ফতোয়া দেয়া হচ্ছে এটা বলা শিরক। বিষয়টি শরীয়তের আলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য বিণীত অনুরোধ করছি।

মুহাম্মদ তোফাইল হোসেন, অলিতলা, বরুড়া, কুমিল্লা।

উত্তর ঃ "ইয়া শাইখ সাইয়েদ সুলতান আবদুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ" বাক্যটি কাদেরিয়া সিলসিলার অন্যতম অজিফা। বিপদমুহূর্তে এই সবক পাঠ করার মধ্যে রয়েছে অশেষ বরকত। এই বাক্য দ্বারা হুযুর গাউসে পাক (রা.) এর কাছে সাহায্য চাওয়া হয়। আর আউলিয়ায়ে কেরমের কাছে সাহায্য চাওয়া ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে অবশ্যই জায়েজ। এতে শিরকের কোন অবকাশ নেই। কারণ পীর মুর্শিদ অলি দরবেশদের কাছে ভক্ত মুরীদরা বিপদমুহূর্তে সাহায্য প্রার্থনা করে একজন রূহানী মুরব্বী হিসেবে তাদেরকে আল্লাহ মনে করে কিংবা আল্লাহর মত সস্ত্বাগত সাহায্যকারী মনে করে কেউ তাদের কাছে সাহায্য চায়না। বরং আল্লাহ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে তাঁরা সাহায্য প্রার্থীদেরকে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআন হাদীসের উদ্ধৃতিসহ ইলমে তাসাউফের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাদিতে অসংখ্য প্রমাণ বিদ্যমান। নিম্নে কয়েকটি দলীল উপস্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছি।

দলীল নং-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ.

অর্থাৎ- হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর দিকে উসিলা তালাশ করো।

মহান আল্লাহর দরবারে পৌছার উছিলা হলো আউলিয়ায়ে কেরাম। যেমন ইমাম শামীর উস্তাদ আল্লামা আবদুল গণী নাবেলসী (রহ:) আল্লামা শায়খ ইজ্জ আহমদ ইবনে আজমী শাফেয়ী হতে বর্ণনা করেন- ইয়া সাইয়েদী আহমদ অথবা ইয়া শাইখ ফুলান ইত্যাদি শিরক নয় কেননা এসব বাক্য দ্বারা উদ্দেশ্য হলো উসিলা তালাশ করা এবং সাহায্য প্রার্থনা করা।

হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র:) আশআতুল লুমআত কিতাবে ইমাম গাজ্জালী (রা:) এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন, যারা জীবদ্দশায় মানুষকে সাহায্য করেন তারা ইনতেকালের পরও সাহায্য করতে পারেন।

তিনি আল্লামা ইবনে হাজার মক্কী (র.) এর বরাতে আরো বলেন- আউলিয়া কেরাম যিয়ারতকারীদেরকে তাদের আদব অনুসারে উপকার করে থাকেন- ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اِذَا ضَلَّ اَحَدُكُمْ (اى عَنِ الطَّرِيْقِ) وَاَرَادَ عَوْنًا وَهُوَ بِاَرْضٍ لَيْسَ فِيْهَا اَنِيْسٌ فَلْيَقُلْ. يَاعِبَادَ اللّٰهِ اَغِيْثُوْنِى وَفِى رِوَايَةٍ اَعِيْنُوْنِى. فَاِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَاتَرَوْنَهُمْ.

অর্থাৎ- তোমাদের মধ্যে কেউ যদি পথ হারিয়ে ফেলে অথবা সে এমন জায়গায় পৌছে সেখানে কোন সাহায্যকারী না থাকে, তাহলে সে যেন এ কথা বলে: হে আল্লাহর গোপন বান্দাগন! আমাকে সাহায্য করুন। কেননা আল্লাহর এমন কিছু বান্দা আছেন যাদেরকে তোমরা দেখনা।

আল্লামা জামালুদ্দীন মালেকী তাঁর ফতোয়া গ্রন্থে উল্লেখ করেন- মানুষ মুহাব্বতের কারণে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া আলী অথবা ইয়া শেখ আবদুল কাদের জিলানী। ইত্যাদি বলে যে সাহায্য তলব করে থাকে সে ব্যাপারে আমার কাছে প্রশ্ন করা হলে আমি উত্তরে বললাম হ্যাঁ এই ধরনের বাক্য অবশ্যই শরিয়ত সম্মত। বিপদ-আপদের মুহূর্তে আম্বিয়া কেরাম, আউলিয়া এজামের উদ্দেশ্যে আহবান করা তাদের নামকে উসিলা বানিয়ে সাহায্য চাওয়া অবশ্যই দ্বীন সমর্থিত বিষয়।

হুজুর গাউসে পাক (রাঃ) নিজেই বলেন-

مَنْ نَادَانِى بِاسْمِى فِى كُرْبَةٍ كُشِفَتْ عَنْهُ.

অর্থাৎ- বিপদ মুহূর্তে কেউ যদি আমার নাম ধরে ডাক দেয় তার বিপদ দূরীভূত হয়ে যায়। অপর বর্ণনায় রয়েছে-

لَوْ اِنْكَشَفَتْ عَوْرَةُ مُرِيْدِىْ وَهُوَ فِى الْمَشْرِقِ وَاَنَا فِى الْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهُ.

অর্থাৎ- যদি পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থানকারী (ঘুমন্ত) আমার কোন মুরীদের সতর খোলে যায় আমি পৃথিবীর পশ্চিমপ্রান্ত হতে বেলায়েতের হাত বাড়িয়ে তার সতর ঢেকে দিতে পারি।

উপরোক্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে স্পষ্ট প্রতিয়মান হলো- ইয়া শায়খ সুলতান সাইয়েদ আবদুল কাদির জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ বলে ডাকা তথা সাহায্য প্রার্থনা করা ইসলামী শরীয়তমতে সম্পূর্ণ জায়েজ এবং গাউসে পাক (রা:) হাজারো সাহায্যপ্রার্থীর সাহায্য করেছেন মর্মে অসংখ্য প্রমাণ যে সমস্ত নির্ভরযোগ্য কিতাবে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে কয়েকটি কিতাবের নাম পাঠক সমীপে উপস্থাপন করা হলো-

(১) সাফওয়াতুস সাফওয়া কৃত: আল্লামা ইবনে জওযী (র:)
(২) রওজাতুজ জাহের কৃত: ইমাম কুস্তলানী (র:)
(৩) রওজাতুজ জাহের কৃত: আল্লামা আবদুল্লাহ ইয়াফেয়ী (র:)
(৪) বাহজাতুল আছরার কৃত: আল্লামা আবুল হাছান শাতনুফী (র:)
(৫) কালায়েদুল জাওয়াহের কৃত: আল্লামা ইয়াহিয়া তাদফী (রা:)
(৬) আনওয়ারুন নাজের কৃত: শেখ আবু বকর বিন নজর (রা:)
(৭) দুররুল ফাখের কৃত: আল্লামা আব্দুল কাদের ইদরুছ (র:)
(৮) নাযহাতুল খাতিরিল ফাতির কৃত: মোল্লা আলী কারী (র:)
(৯) আত তুহফাতুল কাদেরিয়া কৃত: আব্দুল হক মোহাদ্দিস দেহলভী (র:)
(১০) জুবদাতুল আসরার কৃত: শেখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলভী (র:)
(১১) নাসরুল জাওয়াহের কৃত: আল্লামা কাজী মালিক মাদরাজী
(১২) আনহারুল মাফাখের কৃত: শেখ মুহাম্মদ গাউস (র:)
(১৩) মুহিউল কাওনাঈন কৃত: শেখ সাইয়েদ বোরহান উদ্দীন কাদেরী হিন্দী (র:)

প্রশ্ন ঃ মাসিক মদিনা ডিসেম্বর '০৭ সংখ্যায় প্রশ্নের উত্তরে লিখেছে-

আপনাকে সৃষ্টি না করলে আমি আসমান সমূহ (কোন কিছুই) সৃষ্টি করতাম না"। এটা লোকমুখে হাদীসে কুদসী হিসেবে যথেষ্ট প্রসিদ্ধ। অথচ হাদীস বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে একমত যে, এটি একটি ভিত্তিহীন বর্ণনা, দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের বানানো কথা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসের সাথে এর সামান্যতমও সম্পর্ক নেই। -এখন প্রশ্ন হলো-মাসিক মদিনার এই দাবী সত্য কিনা?

উত্তর ঃ মাসিক মদীনার উল্লেখিত উত্তর সঠিক নয়। বরং একটি সত্য বিষয়কে গোপন করতে গিয়ে উত্তরদাতা মিথ্যা ও প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। হাদীস শরীফের ব্যাপারে তার আওতাকে আড়াল করার প্রয়াস চালিয়ে যেমন নিজে গোমরাহ্ হলেন- তেমনি সরলমনা পাঠকমহলকে বিভ্রান্তিতে ফেলে দিলেন। অথচ "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সৃষ্টি না হলে আসমান যমীন গ্রহ নক্ষত্র কুল কায়েনাত- এক কথায় মহাবিশ্বের যা কিছু আছে- তার কোন কিছুই সৃষ্টি হতো না", মর্মে অনেক হাদীস শরীফ বর্ণিত রয়েছে- যা বিভিন্ন সূত্রে নির্ভরযোগ্য বিভিন্ন হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে। নিম্নে উক্ত বিষয়ে একাধিক হাদীস মাসিক সুন্নীবার্তার সম্মানিত পাঠকদের সমীপে পেশ করা হলো।

لما اقترف ادم الخطيئة قال رب اسالك بحق محمد لما غفرت لى قال وكيف عرفت محمدا؟ قال لانك لما خلقتنى بيدك ونفخت فى من روحك رفعت راسى- فرايت على قوائم العرش مكتوبا لااله الاالله محمد رسول الله. فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا احب الخلق اليك. قال صدقت يا ادم ولولا محمد ما خلقتك. وفى رواية عند الحاكم. فقال الله تعالى صدقت يا ادم انه لاحب الخلق الى. اما اذا سالتنى بحقه. فقد غفرت لك ولولا محمد ما غفرت لك وما خلقتك.

অর্থাৎ- "হযরত আদম (আঃ) আল্লাহর দরবারে আবেদন করেছিলেন- হে প্রভু! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামার উসিলায় আমাকে ক্ষমা করুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন- তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কিভাবে চিনেছ? জবাবে আদম (আঃ) আরয করলেন- হে আল্লাহ! আপনি স্বীয় কুদরতি হাতে আমাকে সৃষ্টি করে আমার দেহের অভ্যন্তরে যখন রূহ প্রবেশ করিয়ে দিয়েছিলেন- তখন আমি মাথা তুলে আপনার আরশের পায়ায় লেখা দেখতে পেলাম- "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহু"। আমি বুঝতে পারলাম- আপনি স্বীয় নামের সাথে এমন একটি নাম মিলিয়ে রেখেছেন- যে নামটি সমগ্র সৃষ্টি জগতে আপনার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন- আদম! তুমি সত্যই বলেছ। নিশ্চয় ঐ নাম সমগ্র জাহানে আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়। যেহেতু তুমি সেই নাম নিয়ে আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছ- সেহেতু আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম। যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হতেন- আমি তোমাকে ক্ষমা করতামনা এবং তোমাকে সৃষ্টিও করতাম না"।

সূত্র ঃ মুসতাদরাকে হাকেম, বায়হাকী, তাবরানী, দালায়েলুন নবুয়ত- ইত্যাদি।

দলীল নং-২

عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اوحى الله تعلى الى عيسى ان امن بمحمد. ومر من ادركه من امتك ان يومنوا به. فلولا محمد ما خلقت ادم ولا الجنة ولا النار ولقد خلقت العرش على الماء. فاضطرب فكتبت عليه لااله الا الله محمد رسول الله فسكن.

অর্থাৎ - হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন - আল্লাহ তায়ালা হযরত ঈসা (আঃ) -এর নিকট অহী

ان كنت اتخذت ابراهيم خليلا .فقد اتخذتک حبيبا. وان كنت كلمت موسى فى الارض تكليما . فقد كلمتک فى السماء. وان كنت خلقت عيسى من روح القدس. فقدخلقت اسمک من قبل ان اخلق الخلق بالفى سنة ولقد وطات فى السماء موطا لم يطاه احد قبلک. ولا يطاه احد بعدك وان كنت اصطفيت ادم. فقد ختمت بک الانبياء. وما خلقت خلقا اكرم على منک. (وساق الحديث الى ان قال) ظل عرشى فى القيامة عليک ممدود. تاج الحمد على راسک معقود. وقرنت اسمک مع اسمى. فلا اذكر فى موضع حتى تذكر معى. ولقد خلقت الدنيا واهلها لاعرفهم كرامتک ومنزلتک عندى .ولو لاك ما خلقت الدنيا.

অর্থাৎ- "হে রাসুল! আমি যদিও ইব্রাহীম (আঃ) কে খলীল বানিয়েছি কিন্তু আপনাকে বানিয়েছি হাবীব। আমি মুসা (আঃ)-এর সাথে দুনিয়াতে কথা বললেও আপনার সাথে কথা বলেছি আসমানে। আমি মুসা (আঃ)কে রূহুল কুদ্‌স থেকে পয়দা করলেও আপনার নাম মেবারককে সমগ্র সৃষ্টি জগত সৃষ্টির দুহাজার বছর পূর্বে সৃষ্টি করেছি। আপনার কদম আসমানের এমন জায়গায়ও পৌছেছে- যেখানে আপনার পূর্বে কারো কদম পৌছেনি এবং ভবিষতেও কারো কদম পৌছবেনা। আমি আদম (আঃ) কে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করলেও আপনাকে বানিয়েছি খাতামূল আম্বিয়া। আমার কাছে আপনার চেয়ে অধিক সম্মানী কাউকে আমি সৃষ্টি করেনি। কিয়ামত দিবসে আমার আরশের ছায়া আপনার উপর প্রসারিত হবে প্রশংসার জয়মুকুট আপনার শীরে শোভা পাবে। আমি আপনার নাম আমার নামের সাথে মিলিয়ে রেখেছি যেখানে আমার যিকির-চর্চা হবে- সেখানে আপনার চর্চাও

নাযিল করলেন, হে ঈসা। তুমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর উপর ঈমান আন এবং তোমার উম্মতের মধ্যে যারা তাঁর যমানা পাবে- তাদেরকে ঈমান আনতে বলো। কারণ যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হতেন- তাহলে আমি না আদমকে সৃষ্টি করতাম- না বেহেশত -দোযখ তৈরী করতাম। আমি যখন পানির উপর আরশ তৈরী করেছিলাম- তখন তা এদিক সেদিক কম্পন (হেলাদুলা) করতে লাগল। অতঃপর আমি তার উপর কালেমা শারীফ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলাল্লাহ" লিখে দিলাম। অতঃপর আরশ স্থির হয়ে গেল।

(নোট ঃ) ইমাম হাকেম অত্র হাদীসকে সহীহ বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শিফাউস সিকাম কিতাবে ইমাম সুবকী (রঃ), আল্লামা সিরাজুদ্দীন বলকীনী তার ফতোয়ার কিতাবে, আল্লামা ইবনে হাজর তাঁর আফজালুল কুরা কিতাবে অনুরূপ মন্তব্য পেশ করেছেন।

দলীল নং-৩

ইমাম দায়লামী (রঃ) তাঁর মুসনদে ফিরদাউস -এ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-থেকে হাদীস বর্ণনা করেন- রাসুলে আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন-

اَتَانِى جِبْرَئِيْلُ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ يَقُوْلُ لَوْلَاكَ مَاخَلَقْتُ الْجَنَّةَ وَلَوْلَاكَ مَاخَلَقْتُ النَّارَ.

অর্থাৎ- "আমার কাছে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) এসে বললেন- আল্লাহপাক ইরশাদ করেছেন- যদি আপনি না হতেন, তাহলে আমি বেহেশত-দোযখ সৃষ্টি করতামনা"।

দলীল নং-৪

আল্লামা ইবনে আসাকের হযরত সালমান ফারসী (রাঃ) হতে বর্ণনা করেন- হুযুর আকরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দরবারে আরয করা হলো- আল্লাহ্‌পাক হযরত মুসা (আঃ)কে কলিমূল্লাহ বানিয়েছেন, হযরত ঈসা (আঃ)কে রূহুল্লাহ, হযরত ইবরাহীম (আঃ)কে খলিলুল্লাহ্‌ এবং হযরত আদম (আঃ) ছফীউল্লাহ উপাধিতে ভূষিত করেছেন। কিন্তু আমাদের নবীজিকে কোন্‌ মর্যাদায় অসীন করেছেন? সাথে সাথেই হযরত জিব্রাঈল (আঃ) হাযির হয়ে গেলেন- আর বললেন- রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন-

আমি পৃথিবী এবং পৃথিবীবাসীকে সৃষ্টি করেছি, আমার নিকট আপনার যতটুকু মর্যাদা ও সম্মান সবটুকু আমি তাদের সামনে প্রকাশিত করব"। রাখুন - لَوْلَاكَ مَا خَلَقْتُ الدُّنْيَا. আপনি যদি না হতেন, তাহলে আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতামনা" ।)

দলীল নং-৫

আল-মাওয়াহেবুল লাদুনিয়া কিতাবে ইমাম কুস্তলানী (রাঃ) বর্ণনা করেন- হযরত আদম (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে আবেদন করেছিলেন- হে আল্লাহ! আপনি আমাকে আবু মুহাম্মদ উপনামে কেন ভূষিত করেছেন? আল্লাহর পক্ষ হতে হুকুম আসলো-হে আদম। তুমি তোমার মাথা তুলে দেখ। আদম (আঃ) মাথা উচিয়ে দেখতেই তাঁর চোখের সামনে আরশের পর্দায় নূরে মুহাম্মদী ভেসে ওঠল। আদম (আঃ) আরয করলেন- ইলাহী! এই নূর মোবারক কিসের? জবাবে আল্লাহপাক ইশাদ করলেন-

هٰذَا نُوْرُ نَبِيٍّ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ. اِسْمُهٗ فِى السَّمَاءِ اَحْمَدُ وَفِى الْاَرْضِ مُحَمَّدٌ. لَوْلَاهُ مَاخَلَقْتُكَ وَمَاخَلَقْتُ سَمَاءً وَلَا اَرْضًا.

অর্থাৎ- "এই নূর হলো ঐ নবীর- যিনি তোমার বংশে আগমন করবেন- আসমানে যার নাম আহমদ- আর যমীনে মুহাম্মদ। যদি তিনি না হতেন- তাহলে আমি না তোমাকে সৃষ্টি করতাম- আর না আসমান-যমীনকে।

দলীল নং-৬

عن على بن طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل قال يا محمد وعزتى وجلالى لولاك ماخلقت ارضى ولاسمائى ولا رفعت هذا الحضراء ولا بسطت هذه الغبراء. (انسان العيون)

অর্থাৎ- হযরত আলী ইবনে আবি তালিব (রা:) নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, আল্লাহপাক ইরশাদ করেন– "হে মুহাম্মদ! আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের শপথ- আপনি না হলে আমি না আসমান সৃষ্টি করতাম- না যমীন। আর নীলআকাশও উত্তোলিত করতামনা, ধুলার ধরাও বিছিয়ে দিতাম না"।
ইনসানুল উয়ূন ফী সীরাতিল আমিনিল মামুন ১ম খন্ড ১৫৭ পৃষ্ঠা

দলীল নং-৭

عن على رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم لم خلقت؟ قال لما اوحى الى ربى بما اوحى .قلت يارب لم خلقتنى؟ قال تعالى وعزتى وجلالى. لولاك ماخلقت ارضى ولاسمائى.

অর্থাৎ- হযরত আলী (রা:) হতে বর্ণিত, তিনি নবীজিকে সম্বোধন করে বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে ? নবীজি তাঁর জবাবে ইরশাদ করলেন- আল্লাহ্পাক আমার কাছে যখন ওহী নাযিল করছিলেন- তখন আমি আরয করেছিলাম- রাব্বুল আলামীন! আপনি আমাকে কি জন্যে সৃষ্টি করেছেন ? জবাবে আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন- আমার ইজ্জত ও জালালিয়াতের শপথ! আপনি যদি না হতেন- তা হলে আমি না জমিন সৃষ্টি করতাম- না আসমান"। (সূত্র : নাজহাতুল মাজালিস ২য় খন্ড ১১৯ পৃ:)

উল্লেখিত হাদীসগুলো ছাড়াও অনেক হাদীস রয়েছে- যার অর্থ হচ্ছে- আমাদের নবীজি না হলে আল্লাহপাক কিছুই সৃষ্টি করতেন না।

উপরোক্ত হাদিস সমূহের সমার্থক আরেকটি হাদীসে কুদ্সী হলো- لَوْلَاكَ لَمَاخَلَقْتُ الْاَفْلَاكَ. (আপনি না হলে আমি আকাশসমূহ সৃষ্টি করতাম না)। এখানে কিন্তু افلاك শব্দটি নিয়ে হাদীস বিশারদদের মধ্যে কিছুটা মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। কেউ কেউ বলেন, افلاك শব্দের পরিবর্তে سماء এসেছে- আর উভয় শব্দের অর্থ আসমান। সুতরাং অর্থের দিক দিয়ে উভয় হাদীসের মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাকে ইলমে হাদীসের পরিভাষায় رواية بالمعنى বলা হয়।

যেমন বিখ্যাত মুহাদ্দিস মোল্লা আলী ক্বারী (র:) স্বীয় গ্রন্থ মওজুয়াতে কবীর-এর মধ্যে লিখেছেন-

لولاك لماخلقت الافلاك قال الصنعانى انه

موضوع .كذافى الخلاصة . لكن معناه صحيح .فقد روى الديلمى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما مرفوعا. اتانى جبرائيل فقال يامحمد لولاك لما ما خلقت الجنة ولولاك ما خلقت النار وفى رواية ابن عساكر لولاك ما خلقت الدنيا (موضوعات كبير)

সানআনী বলেন,- لولاك لماخلقت الافلاك.

এই হাদীসটি موضوع শব্দ, কিন্তু অর্থের দিক দিয়ে موضوع নয়। কেননা, ইমাম দাঈলামী (র:) উক্ত হাদীসটি হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা:) -এর সূত্রে مرفوع হিসেবে উল্লেখ করেছেন। নবীজি ইরশাদ করেন, "আমার কাছে হযরত জিব্রাইল (আ:) এসে বলেন, আল্লাহ্পাক ইরশাদ করেন, "আপনি যদি না হতেন আমি বেহেস্ত সৃষ্টি করতাম না এবং দোজখ সৃষ্টি করতাম না"। আল্লামা ইবনে আসাকের (র:) -এর বর্ণনায় রয়েছে "আপনি যদি না হতেন আমি দুনিয়া সৃষ্টি করতাম না"। (সূত্র : মাওজুয়াতে কাবীর কৃত মোল্লা আলী ক্বারী) ৫৯ পৃষ্ঠা

মাওলানা আব্দুল হাই লখনৌভী বলেন-

لولاك لماخلقت الافلاك. হাদীসটি শব্দগতভাবে এমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে যে, যেমন প্রসিদ্ধি লাভ করেছে- اول ما خلق الله نورى হাদীসটি। উভয়টি শব্দগতভাবে প্রমাণিত না হলেও অর্থগতভাবে প্রমাণিত। হাদীস দু'রকমে বর্ণনা করার পদ্ধতি রয়েছে। এক প্রকার হলো হুবহু শব্দ বর্ণনা করা। অপরটি হলো- মর্ম বর্ণনা করা। এই হাদীসের শব্দাবলী হুবহু না হলেও মর্মাবলী সঠিক। (সূত্র : আল আসারুল মারফুআ ৩৫ পৃষ্ঠা)

ইমাম দাইলামী মুসনাদে ফেরদাউসে, ইমাম আহমাদ কুস্তলানী মাওয়াহেবে লাদুনিয়ায়, শেখ আব্দুল হক মোহাদ্দেসে দেহলভী মাদারেজুন নবুওয়্যাতে এবং আরও অসংখ্য মুহাদ্দিস স্ব-স্ব গ্রন্থে- لولاك لماخلقت الافلاك. হাদীসখানা বিভিন্ন ভাষায় উল্লেখ করেছেন; যা প্রমাণ করে বিশ্ব বিখ্যাত ওলামায়ে কেরামের নিকট-

لولاك لماخلقت الافلاك. হাদীসখানা মর্মগতভাবে বিশুদ্ধ হাদীস হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

শাব্দিক ভিন্নতা সত্ত্বেও অর্থগত দিক দিয়ে অভিন্ন বর্ণনাকে رواية بالمعنى বলে। উসূলে হাদীসের পরিভাষায় এই ধরনের বর্ণনা জায়েয। সুতরাং ইহা জাল বা বানোয়াট নয়। (সূত্র : শরহে নুখবাতুল ফিকির পৃষ্ঠা ৬৭)

ইমাম রব্বানী মুজাদ্দেদে আলফে সানী (র:) মাকতুবাত শরীফের বিভিন্ন জায়গায় বারবার উক্ত হাদীস উল্লেখ করেছেন। যা থেকে প্রমাণিত হয়, উক্ত হাদীস তাঁর নিকট বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য। দেখুন- মাকতুবাতে ইমাম রব্বানী, নবম খন্ড, ১৫৫ পৃষ্ঠা মকতুবাত সংখ্যা ১২২)

আল্লামা মাহমুদ আলুসী বাগদাদী (র:) তাফসীরে রুহুল মায়ানী ১ম খন্ড ৫১ পৃষ্ঠায় উক্ত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন।

এমনকি- ওহাবী দেওবন্দীদের একজন শীর্ষ নেতা মৌলভী জুলফিকার আলী দেওবন্দী ক্বাসীদায়ে বুরদাহ্র একটি পংক্তির ব্যাখ্যায় লিখেছেন-

وقوله لولاه اقتباس من حديث.

অর্থাৎ ইমাম বুসরী (র:) স্বীয় রচিত কবিতাংশে لولاه শব্দটি উদ্ধৃত করেছেন- لولاك لماخلقت الافلاك. হাদীস থেকে। সুতরাং বুঝা গেল- উক্ত দেওবন্দীর শীর্ষ আলেমও উহাকে হাদীস হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছেন।

উপরোক্ত প্রামাণ্য দলীলাদি উপস্থাপনের পর আশা করি সম্মানিত পাঠকদের কাছে এ বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। মর্মগতভাবে হাদীসটি বিশুদ্ধ এবং হাদীসে মশহুর হিসেবে পরিচিত। মাসিক মদিনার কথা অগ্রহণযোগ্য।

আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এর পথে
"বাংলাদেশ যুব সেনায়" যোগ দিন।

যোগাযোগ
মোহাম্মদ মোস্তাক আহমেদ- ০১৯১১৯৬৪২৮৬
মোহাম্মদ ফারিজুল বারী- ০১৯২১৩০৮০৫৯
মোহাম্মদ সেকান্দর হোসেন (সুমন)- ০১৭১৬৫৭৩৩৩৩

পোঃ রেজিঃ নং- ডি এ ঢাকা ৫০২৮, ৪৯ তম সংখ্যা, মার্চ'১১ ইং , মূল্য ১২.০০ টাকা

অধ্যক্ষ হাফেয এম.এ. জলিল সাহেবের লিখিত সুন্নী আক্বিদাসম্পন্ন বইগুলো পড়ুন এবং আক্বিদা শুদ্ধ করুন

বই	হাদিয়া
হায়াত মউত কবর হাশর	৪০০.০০
নূর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)	২৫০.০০
আ'লা হযরতের 'ইরফানে শরিয়ত'	১৩০.০০
প্রশ্নোত্তরে আক্বায়েদ ও মাসায়েল	১২০.০০
ফতোয়ায়ে ছালাছীন বা ত্রিশ ফতোয়া	৮০.০০
আহকামুল মাযার	৮০.০০
শিয়া পরিচিতি	৬০.০০
মিলাদ ও কিয়ামের বিধান	৬০.০০
ফতোয়া ছালাছা	৩০.০০
ইসলাহে বেহেস্তী জেওর (সাদা)	৭০.০০
কালেমার হাক্বীকত	৮০.০০
কারামাতে গাউসুল আযম	৫০.০০
বালাকোট আন্দোলনের হাকিকত	(নিঃশেষ)
গেয়ারভী শরীফের ইতিহাস	(নিঃশেষ)
ফতোয়াউল হারামাঈন	(নিঃশেষ)
সফর নামা আজমীর	(নিঃশেষ)
ঈদে মিলাদুন্নবী ও না'ত লাহরী	(নিঃশেষ)
মহাসমর কাব্যের ব্যাখ্যা	(পান্ডুলিপি)

প্রাপ্তি ঠিকানা : উজ্জীবন লাইব্রেরী, মাদ্রাসা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭। মোবাইল : ০১৮১৫৪১০২৬২

আলহাজ্ব মোহাম্মদ আব্দুর রব, "মা নীড়" ১৩২/৩ আহমদবাগ, (২য় লেন) সবুজবাগ, ঢাকা- ১২১৪, ফোন : ৭২৭৫১০৭, ০১৭২-০৯০৬৯৯৬

বিঃদ্রঃ ৫০০০ টাকার পাইকারগণের জন্য ২০% কমিশন। ৫০০ টাকা হলে বিনা কমিশনে ভিপি করেও পাঠানো হয়।

সুন্নী মুবাল্লিগ ও সুন্নীবার্তার এজেন্সী ঠিকানা-১

- উত্তর শাহজাহানপুর গাউসুল আযম জামে মসজিদ, ঢাকা।
- গাউসুল আযম ফাজেলিয়া মাদ্রাসা, এতিমখানা ও জামে মসজিদ, ..., চাঁদপুর।
- মাওঃ হেলাল উদ্দিন, ..., কোনাবিল, ..., কিশোরগঞ্জ।
- মাওলানা হাবিব মিয়া, ... জামে মসজিদ, সিলেট রোড, ...।
- মোঃ আঙ্গুর মিয়া, ..., কিশোরগঞ্জ।
- মাওঃ মোঃ নওশেরুজ্জামান, ..., ... মাদ্রাসা, ...।
- মিডিয়া প্রাস, ..., কুমিল্লা সদর।
- মোঃ রমজান আলী, ..., বি-বাড়িয়া।
- মাওঃ গোলাম গাউস, ... দরবার শরীফ, ..., চাঁদপুর।
- আলহাজ্ব ডাঃ আনওয়ার হোসেন, ..., নরসিংদী।
- ইসলামী ছাত্রসেনা, ..., বি-বাড়িয়া।
- মাওলানা মুফতী ফারুক আহমেদ, ... শরীফ মাদ্রাসা, ..., বি-বাড়িয়া।
- পীরে তরিকত জামাল উদ্দিন মোমেন, ... দরবার শরীফ ..., ...।
- মুফতি এম.এ. তাহের, ..., কুমিল্লা।
- মোঃ এরফান শাহ (ফারুক), ..., চাঁদপুর।
- ক্বারী মৌঃ মোঃ তৈয়ব আলী, ..., হবিগঞ্জ।
- মোঃ তাজরুল ইসলাম, ..., সিলেট।
- খড়িয়ালা দরবার শরীফ, ... রোড, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ আবু বকর ছিদ্দীক, ..., সুনামগঞ্জ।
- মাওঃ মোঃ ইয়াকুব আলী রহনী, ..., কিশোরগঞ্জ।
- মোহাম্মদ ফাহিম কাদেরী, ..., নীলফামারী।
- মুন্সী আঃ শুক্কুর, ..., নরসিংদী।
- মৌলভী মোঃ ইছহাক, ..., কুমিল্লা।
- মাওলানা আবু সুফিয়ান আল-কাদেরী, ..., চাঁদপুর।
- বাদশা হেলাল, ..., শাহজাহানপুর, জেলা: সিরাজগঞ্জ।
- মৌলভী শাহজাহান, গ্রাম + পোঃ- ..., নারায়ণগঞ্জ।
- মাওঃ আবুল কাসেম নূরী, ..., বি-বাড়ীয়া।
- মাওঃ আবদুল আজিজ, ..., বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ মোশারফ হোসেন মিয়াজী, ..., কুমিল্লা।
- মাওঃ আব্দুস সামাদ আজাদী, ..., কিশোরগঞ্জ।
- ডাঃ শহীদুল্লাহ, ..., নরসিংদী।
- মাওঃ সাইদুর রহমান সুন্নী আলকাদরী, ..., নারায়ণগঞ্জ।
- কাজী আবদুল মালেক, ..., বি-বাড়ীয়া।
- মুফতি মোঃ তাজউদ্দিন, ..., হবিগঞ্জ।
- মুফতি বজলুর রহমান, ... মাদ্রাসা, ..., কুমিল্লা।
- বারকাউনিয়া শাহজালাল (রহঃ) জামে মসজিদ, ..., কুমিল্লা।
- আলহাজ পীর সৈয়দ নঈমউদ্দিন, ... দরবার শরীফ, বি-বাড়ীয়া।
- মোঃ আবু সুফিয়ান, ..., কুমিল্লা।
- মোঃ আবু সুফিয়ান , ..., মুন্সীগঞ্জ।
- মাহফুজুর রহমান, ..., কুমিল্লা।
- গাউসিয়া সোবহানিয়া দাঃ মাদ্রাসা, ..., চাঁদপুর।
- সনি আশরাফী, ..., জেলা: পাবনা।
- মোশারফ হোসেন, ..., কুমিল্লা।
- মর্তুজা আলী, ..., জেলা: হবিগঞ্জ।
- MD. AHMED CHOWDHURY, 14, Bread Field Court, Hawley Road, Camdentown, London, NW1-8Rn U.K. Ph. 02072843136
- MD. AHAD MIAH, 124 Sand Well Street, Caldmore, Walsall Wsl-3Eg West Midlands, U.K. Ph. 01922-639817
- MR. MAKADDUS MIAH, All Seasons Dry Cleaning & Landuary 147/A Caldmore Road, Walsall, WS1 3RF Uk. Ph. 01922-6220093
- SYED MOSTAQUE MIAH, 41, Napier Street West, Oldham, OL8-4AE Uk. Ph. 0161-6270119
- MR. ABDUL WAHID, 44-17-25 Th Ave (2Nd Floor) Astoria, NY-11103 U.S.A. Tel : 718-6267695
- ALHAJ ANFORUL ISLAM, 56 A, Glen Burn Road, Kings Wood Bristol, BS15-IDP-U.K. Ph. 01179610560
- MD. MUZIBUR RAHMAN, 95, Wills Street, Lozells, Birmingham, B19-2AL, Uk
- SYED WAISUR REZA, 18, Normanton Drive, Lough Borough LE-11-INT, U.K. Ph. 01509264582
- MD. ANWAR MIAH, 152 Winsor Road, Off Country Road Hull, Hu5-4 HH, North Hamber Side, U.K. Phone : 01482-657814
- MD. SAIFUR RAHMAN KHAN, Shiefield, S9-4Rh Uk Tel : 0114-261028/3
- S.M. HASSAN, 68, Parkfield St. RushLome ,Manchester
- SHUHELUL HAQUE, Southport, 01704380574
- M.A. HOSSAIN, 96, Normunt Rd. Fenham, New Castle Upontyne, NE4-8SH, Uk. Tel : 0191-226017
- CHOMOK ALI, 358 Stani Forth Road, (Darnall) Shefield S93Fu. U.K. Tel : 00114-242261
- SYED MOHAMMAD ALI, 24 Stubbington Avenue Northend, Portsmouth, Po2-OHT, Uk. Ph 0239266227
- ABUL KASHEM MALIK, 36 Priston Ville Road Brighton, BN1-3Tj Uk. Ph. 01273820628
- MR. SHAHABUDDIN, 101, Brook Drive, London SE11-4TU, Uk. Ph. 02077359744
- SYED MUQTASID, 32 Brougham St. Burnley, Lancashire BB12-OAS, Uk. Ph- 01282-623138
- ASHIK UDDIN, 142 Nottingham Road, Loughborough LE11-1Ex, Uk. Ph 01509-269109
- MR. KHAIRUL BASHAR (SHAJ), 24 Albart Walk North Wool Wich, E16-2NL Uk. Tel : 0207-4733514
- MR. SALIK MIAH, 27 Nelson Road, Aston, Birmingham Ph ...
- ABDUL MALIK, 5 Deburgh Street Riverside, Cardiff UK. Ph ...
- ZIAUR RAHMAN, Birmingham, B19-1HG UK Tel 0121-...
- SM. MIZANUR RAHAMAN, Po Box No 345, Buraydah K.S.A.

ডাঃ দিলরুবা ইয়াসমীন কর্তৃক প্রকাশিত এবং আল কারনী প্রিন্টার্স, ১০০/এ, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০ হতে মুদ্রিত
ফোন : ৯১১১৬০৭, E-mail : hafez_ma.jalil@yahoo.com. Websote: http:// Sunnibarta.wordpress.com